অনীক

মে ২০১১
বর্ষ ৪৭ ❑ সংখ্যা ১১

সম্পাদকীয় । ১

ঘটনাপ্রবাহ
পস্কো বিরোধী সংগ্রাম... এবং গণতন্ত্র। প্রণব দে। ৩
দুর্নীতির বিরুদ্ধে... আন্না হাজারে । দামিনী চৌধুরী। ৭
মিশর-বিপ্লব কোন্ পথে?। দীপ্র চৌধুরী। ৮
ফুকুসিমা এখন কেমন?। শুভাশিস মুখোপাধ্যায। ১০
বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের লড়াহ। প্রতিবেদক। ১১
জলাভূমি সংরক্ষণ আন্দোলনের শহিদ তপন দত্ত। ২

সেই সময় - এই সময়
আমাদেরই সন্তান-সন্ততি। অশোক মিত্র। ১৩

লাদেন হত্যা
পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। নোয়াম চমস্কি । ১৫
লাদেনের 'জেহাদ' ও সন্ত্রাস। পার্থ সারথি। ১৬
কে বড় সন্ত্রাসবাদী?। মিতা দত্ত। ১৯
লাদেন ও সাম্রাজ্যবাদ। দীপংকর চক্রবর্তী। ২০

প্রবন্ধ
জিন পরিবর্তন... মুনাফা। শুভ্রকেতন বসু। ২১
জিন-পরিবর্তিত খাদ্য : কেন শঙ্কিত। সমরেশ মিত্র। ২৪
রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা ও রাষ্ট্র। অংশুমান ভৌমিক। ৩২
চার অধ্যায়: পঞ্চমাংক বা পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। জয়ন্ত দাস। ৩৬

বিতর্ক
পরিবর্তনের সাত কাহন। শঙ্কর মিত্র/পূর্ণেন্দু বসু। ৩৯

স্মরণ
জন্মশতবর্ষে ফয়েজ ধারা চট্টোপাধ্যায়। ৩০
ফয়েজ আহমদ ফয়েজ-এর কবিতা। ৩১

যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৯

দূরভাষ
সম্পাদক : ৯৪৩২৮৭৭৫৬০।
গ্রাহক-সম্পর্কিত : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২ / ৯৮৩০৪৩৩৬৫
ই-মেল : aneek64@gmail.com

কার্যালয়
১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা - ৭০০ ০০৯
(মঙ্গল/শুক্র : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

সম্পাদক : **দীপংকর চক্রবর্তী। রতন খাসনবিশ**

äÆ îINÕÌ

নির্বাচন ও তার পর

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সবচেয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও উত্তেজনাময় বিধানসভা নির্বাচনপর্ব মোটামুটি নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়ে গেছে, ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে। অভূতপূর্ব ও চরম ভরাডুবি ঘটেছে দুনিয়ার সম্ভবত সবচেয়ে দীর্ঘদিনের স্ব-ঘোষিত 'বাম' শাসনের। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, এই রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ প্রায় এরকমটাই প্রত্যাশা করছিলেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে এটাই যে, জলের মধ্যে মাছের মতো জনগণের সাথে মিশে থাকার দাবিদার বর্তমান শাসক পার্টিগুলির 'বিপ্লবী' নেতারা সেটা কেউই প্রায় আগে বুঝতে পারেন নি। এ থেকেই ধরা পড়ে জনগণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতার গভীরতা। যে কোনো সচেতন মানুষই স্বীকার করবেন, বিগত ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে 'বাম' মোড়কে যে নতুন ধরনের স্বৈরতন্ত্রের পত্তন তারা ঘটিয়েছেন, প্রকৃত বামপন্থা থেকে মতাদর্শগত ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গুণগতভাবে যে দুস্তর দূরত্বে তারা সরে গেছেন, এ ছাড়া তার স্বাভাবিক পরিণতি আর কিছু হতে পারতো না।

ফলত এই মেকি বামপন্থীদের বিদায়ে আমাদের দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই। বরং কী কী করলে বামপন্থার অধঃপতন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তাদের কার্যকলাপ ও বিচ্যুতিগুলিকে পর্যালোচনা করে সেই 'নেতিবাচক' শিক্ষা আমরা অর্জন করতে পারি। প্রকৃত বামপন্থার পথ-অনুসন্ধানকারী বিপ্লবী শুভেচ্ছাসম্পন্ন রাজনৈতিক কর্মীরা তার ভিত্তিতে সঠিক কর্মসূচি গড়ে তোলার এবং বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের অনুশীলন প্রচেষ্টা চালাতে পারেন।

কিন্তু নতুন তৃণমূল-ও-মূল কংগ্রেসের জমানায় সে সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। সদ্য-নির্বাচিত শাসকবৃন্দ স্পষ্টতই ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয়েছেন সিপিআই(এম)-সহ বিভিন্ন সংসদীয় বামদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনতার ব্যাপক বিদ্রোহের রথে ভর করে। তাদের কাছ থেকে ভাসাভাসা কিছু প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস ছাড়া এমন কোনো সুস্পষ্ট মতাদর্শগত অবস্থান বা কর্মসূচি আমরা পাই নি, যার ভিত্তিতে আমরা আশ্বস্ত থাকতে পারি। বরং উল্টোদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ভিত্তি যে কংগ্রেসি মতাদর্শ, তার ফলশ্রুতিতেই আমরা ১৯৪৭-পরবর্তী ভারতে পেয়েছি শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের ধারাবাহিকতা। তার উপর গত দু'দশক ধরে অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদ-প্রণোদিত বিশ্বায়ন কর্মসূচির পত্তন ঘটেছে এদেরই উৎসাহে, কংগ্রেসের জাতীয় স্তরে বিকল্প শক্তি বিজেপি-ও সে পথের পথিক, এবং এই দুই দলের পরিচালিত সরকারের মন্ত্রী হিসেবে মমতাও এতোদিন মহা উৎসাহে এই সর্বনেশে পথই অনুসরণ করে এসেছেন। আজ কি তিনি পারবেন সেই পথ বর্জন করে প্রকৃত জনস্বার্থের কর্মসূচি অনুসরণ ও কার্যকর করতে?

অথচ মানুষ কিন্তু তাঁর কাছে সেটাই প্রত্যাশা করে। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ও লালগড়ের সংগ্রামী জনতার ঐতিহাসিক বিস্ফোরণ, তাদের সংগ্রামের রক্ত-ঘাম-অশ্রুই তাঁকে সুযোগ করে দিয়েছে [illegible] ও

অলীক সেই ফিনিক্স পাখির মতো মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে। মমতার কৃতিত্ব এখানেই যে, দক্ষতার সঙ্গে ওই দু'টি ব্যাপক গণচেতনা-সঞ্চারী আন্দোলনের ফসল তিনি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। জেগে ওঠা নাগরিক সমাজও তাঁর এই ভূমিকাকে মূলত বরণ করে নিয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত ওই দু'টি লড়াইয়ের কাঁধে ভর দিয়েই মমতা ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে এক নতুন ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন— যা তাঁর নির্বাচনী যুদ্ধজয়ের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। কাজেই মানুষ তাঁর কাছে স্বভাবতই আজ প্রত্যাশা করবে : তিনি পেশীশক্তির ভিত্তিতে সরকারি বা দলীয় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার বদলে কার্যত কেড়ে-নেওয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি ফিরিয়ে দেবার জন্য উদ্যোগ নেবেন, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন; কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে সেজ-সহ সমস্ত বিশ্বায়ন কর্মসূচির বিরোধিতা করবেন; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সচেষ্ট থাকবেন; পেন্সন বিলের মতো শ্রমিক-কর্মচারীর স্বার্থবিরোধী সমস্ত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন; এবং জনস্বার্থ-বিরোধী সমস্ত কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের সাধ্যমতো বিরোধিতা করবেন।

মনে রাখা দরকার, আজ থেকে ৩৪ বছর আগে বামফ্রন্ট সরকারও ক্ষমতায় এসেছিল বিপুল মানুষের শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও সমর্থন নিয়ে। জনগণের প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মানুষ আজ তাদের ছুঁড়ে ফেলেছে। মমতাকেই ঠিক করতে হবে— তিনি তাদের পথে যাবেন কিনা। ইতিহাস কিন্তু তাঁকেও তাহলে ক্ষমা করবে না।

জলাভূমি সংরক্ষণ আন্দোলনের শহিদ তপন দত্ত

গত ৬ মে ২০১১ রাত প্রায় দশটায় হাওড়া জেলার বালী থানার অদূরে ঘোষপাড়া রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী তপন দত্তকে দুষ্কৃতীকারীরা গুলি করে হত্যা করে। বালী-জগাছা অঞ্চলে সাঁপুইপাড়া-আনন্দনগর সংলগ্ন বোম্বে রোডের ধারে ২০০০ বিঘার এক বিশাল জলাশয় জয়পুর বিল নামে পরিচিত। এই বিলটির কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর কিছু অংশ রেল দপ্তরের অধীনে। বালী-জগাছা অঞ্চলে এরকম অনেকগুলি ছোটোবড়ো জলাশয় আছে এবং এই জলাশয়গুলিই ঐ অঞ্চলের নিকাশী ব্যবস্থাকে ধরে রেখেছে। বর্ষাকালে বাড়তি জল এই জলাশয়গুলিই ধারণ করে।

জলাশয় সংক্রান্ত সমস্ত রকম বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বিভিন্ন কর্পোরেট ও ব্যবসায়ী সংস্থা এই জলাশয়গুলি ভরাট করতে শুরু করেছিল। আনমোল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, মারলিন, ডিএলএফ, ফ্রাঙ্ক রস ইত্যাদি সংস্থা এই কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনুসঙ্গ হিসাবে গজিয়ে ওঠে ঠিকাদারদের সিন্ডিকেট। তপন দত্ত জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে স্থানীয় স্তরে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। গঠন করেছিলেন 'জলাভূমি বাঁচাও কমিটি'। ২০১০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মাটিভর্তি অনেকগুলি ট্রাক এসেছিল জলা ভরাট করতে। ট্রাকগুলির সামনে ব্যারিকেড তৈরি করা হলো। সেদিন আর ট্রাকগুলি মাটি ফেলতে পারে নি। ২০০৯ সালে হাইকোর্টে জলা ভরাটের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। সেই মামলা এখনও চলছে। যাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ঘা পড়েছিল, তারা তপনবাবুর ভূমিকাকে ভালো ভাবে নেয় নি। এর আগেও তপনবাবুকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বারের প্রচেষ্টায় হত্যাকারীরা সফল হলো।

৩ মে হাওড়া জেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জেলায় নির্বাচনের পরে এবং পঞ্চম দফা নির্বাচনের আগের দিন খুব পরিকল্পিতভাবে খুনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। খুনটা হয়েছিল বালী থানা থেকে ফেরার পথে। পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। কিন্তু এই খুনে কাদের স্বার্থ সিদ্ধ হতে পারে, সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। তপন দত্ত তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড নিছক রাজনৈতিক দলাদলির ফলশ্রুতি নয়। একজন পরিবেশ-কর্মীকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। *অনীক* এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করছে এবং অবিলম্বে খুনি ও এই ঘটনার সঙ্গে লিপ্ত ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করছে। জলাভূমিগুলির যথাযথ সংরক্ষণের জন্যও সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সূত্র: সিটিজেন রাইটস এন্ড ফোরামের ১১ মে ২০১১ তারিখের প্রচারপত্র

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

পস্কো বিরোধী সংগ্রাম, নবীন-রমেশ জোট এবং গণতন্ত্র

উড়িষ্যার নিয়মগিরি অঞ্চলে 'বেদান্ত অ্যালুমিনিয়ামের' পরিবেশ-ছাড়পত্র আটকে দিয়ে, কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশ বেশ একটা বিপ্লবী ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টায় ছিলেন। নিজের ভাবমূর্তির ব্যাপারে রমেশ মশাই বেশ সচেতন। মাঝে মধ্যেই বিতর্কমূলক উক্তি করে রমেশ মশাই মিডিয়ার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন। কারণ তিনি বা তাঁর মতো রাজনীতিকরা জানেন, এই দেশের গণতন্ত্রটা আসলে ভাবের গণতন্ত্র। ভাবের গণতন্ত্রে ভাবমূর্তির চলটাই বেশি।

কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাবমূর্তির ব্যবসা চলে না। তীব্র গণ-আন্দোলনের মুখোমুখি হলে অথবা দেউলিয়াপনা চরম পর্যায়ে পৌঁছলে, ঝানু রাজনীতিকদেরও আসল মূর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিটি বেগুন নিয়ে রমেশ মশাই যখন সওয়াল করছিলেন, তখন দেশজোড়া বিক্ষোভের মুখে কিংবা মহারাষ্ট্রে জয়িতাপুরে পরমাণু চুল্লি প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়ে রমেশ মশাই 'পরিবেশ বান্ধব' ভাবমূর্তি ধরে রাখতে পারেন নি। বিজ্ঞানীদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনই মনে করছেন না তিনি। খোলাখুলি পুঁজির হয়ে, বিশেষত বিদেশি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষার তদ্বির করে চলেছেন। দেশের যেখানেই জল-জঙ্গল-জমি-পরিবেশ ধ্বংস করে বহুজাতিক সংস্থা পুঁজি বিনিয়োগের জায়গা খুঁজেছে, রমেশ মশাইয়ের সরকার এবং দপ্তর সেখানেই একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছে। বেদান্তকেও সরকার বেশিদিন অখুশি রাখবে বলে হয় না।

অতি সম্প্রতি, ২ মে, ২০১১ তারিখে, রমেশ মশাই, উড়িষ্যাতেই এক বহুজাতিক দৈত্য, পোহাং স্টিল কোম্পানী, সংক্ষেপে পস্কোকে ১২৫৩ হেক্টর বনভূমি রূপান্তর বা সহজ কথায় ধ্বংসের অনুমতি দিয়ে, তাঁর এবং জাতীয় সরকারের বহুজাতিক পুঁজির সেবাদাসত্বের আর একটি নিদর্শন খাড়া করলেন। পস্কোকে যে অরণ্য উপঢৌকন দেওয়া হবে, এটা পূর্ব-গৃহীত সিদ্ধান্ত। সময়টা লেগেছে গণতন্ত্রের ভাবমূর্তির আড়াল রেখে লুঠতরাজ চালানোর প্রচেষ্টায়। বিশেষত, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পরবর্তী অধ্যায়ে, সারা ভারত জুড়ে যে বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে তাড়াহুড়ো করলে শাসক দলের নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। অবশ্য উড়িষ্যার নবীন পট্টনায়ক সরকারের নির্বাচনী বিপর্যয়ের আশঙ্কা অতটা ছিল না বলেই পস্কোর স্বার্থে তাঁর পুলিশ ও প্রশাসন ছিল নির্মম এবং বেপরোয়া।

২০০৫ সালের ২২ জুন, উড়িষ্যা সরকার পস্কোর সঙ্গে বছরে ১২ টন ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কারখানা, তৎসংলগ্ন নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র ও বন্দর (captive power plant and port) স্থাপনের জন্য সমঝোতা চুক্তি (Memorandum of Understanding or MOU) সই করে। পস্কোর বিনিয়োগের পরিমাণ ৫১ হাজার কোটি টাকা। চুক্তির যে বিষয়গুলি বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো—

১) উড়িষ্যা ইনডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভালাপমেন্ট কর্পোরেশন মারফত পস্কোকে জমি দেওয়া হবে—

ক) ভুবনেশ্বর শহরে কোম্পানির অফিসের জন্য ২০-২৫ একর

খ) ইস্পাত ও বন্দর প্রকল্পের জন্য ৪০০৪ একর

গ) টাউনশিপ নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত ২০০০ একর; এবং

ঘ) অন্য প্রয়োজনে কোম্পানির দাবি মতো এর অতিরিক্ত জমি, যতো চাই।

২) খনি এবং খনিজ

ক) রাজ্য সরকার পস্কোকে তাদের নিজস্ব কয়লা খনির (captive coal mine) জন্য উপযুক্ত খনি অঞ্চল বরাদ্দের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করবে।

খ) কোম্পানীর দাবি মতো ১২ টন ইস্পাত উৎপাদনের জন্য বছরে ৬০ কোটি টন লৌহসমৃদ্ধ আকর সরবরাহ করা হবে। এই ধরনের আকরে লৌহ থাকে ৬২ শতাংশ এবং ভালো পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম খনিজও থাকে। ৩০ শতাংশ পর্যন্ত উচ্চ মানের এই আকর, কোম্পানি সম পরিমাণের নিম্ন মানের আকরের সঙ্গে বিনিময় করতে পারবে [The Company may swap certain quantities (not exceeding 30% of the total requirement for the Paradeep Plant annually) of such iron ore which have high alumina content with equal quantity of low alumina content iron ore of equivalent or better Fe content imported for blending, in order to produce better quality steel in the Paradeep Project and conserve energy]।

গ) কোম্পানির অনুরোধ মতো তাদের দক্ষিণ কোরিয়ার কারখানার জন্য অতিরিক্ত ৪০০ মেট্রিক টন আকর লোহা রপ্তানীর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩) মহানদী বাঁধ থেকে প্রয়োজন মতো জল সরবরাহ করা হবে (প্রতিদিন ১,০৯,০০০ কিউবিক মিটার বা ১০.৯০ কোটি লিটার জল)।

৪) সেজের জন্য কোম্পানি আবেদন করলে রাজ্য সরকার তা অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করবে।

৫) সমঝোতাটি পাঁচ বছরের জন্য বহাল থাকবে। পারস্পরিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরবর্তী কালে মেয়াদ বৃদ্ধি করা

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

হবে। কিন্তু এই পাঁচ বছরে নির্মাণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন, প্রকল্প স্থানে বিনিয়োগ ইত্যাদি খাতে প্রথম পর্যায়ের জন্য যতটা ধার্য করা হয়েছে, কোম্পানি যদি সে ক্ষেত্রে সরকারকে খুশি করার মতো যথেষ্ট অগ্রগতি না করতে পারে, কোনভাবেই মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না।

এটা উন্নয়ন, না সম্পদ লুঠের প্রকল্প? পস্কো শুধু উৎপন্ন ইস্পাতই রপ্তানী করবে না, অপকৃষ্ট খনিজের বদলে এদেশের উৎকৃষ্ট খনিজও লুঠ করে নিয়ে যাবে। কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, বনবাসী সহ ২০,০০০-এর বেশি মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন, মানুষ পানীয় জল পাবে না, কৃষকরা জমিতে সেচের জল পাবে না। বিনিময়ে কোটি কোটি টাকার সম্পদ ও মুনাফা পাচার হবে ভারতের বাইরে।

জগৎসিংহপুরের তিনটি পঞ্চায়েত এলাকায় ৮টি গ্রাম পস্কোর খাদ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ৪০০৪ একরের তিন-চতুর্থাংশই বনভূমি। সরকারি রেকর্ডে ৩০৯৬.৭২ একর ছিল জঙ্গল বা বনভূমি, ৪৬৮.৬০ একর অন্যান্য সরকারি জমি এবং ৪৩৭.৬৮ একর ব্যক্তি মালিকাধীন জমি। 'পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি-র' মতে নামে সরকারি হলেও এই জমি স্থানীয় বহু মানুষের জীবিকার উৎস। পান বরোজ, কাজু বাদাম এবং অন্যান্য আরো বাণিজ্যিক ফসল চাষ করে প্রায় ৪০০০ হাজার পরিবার জীবিকা নির্বাহ করে। অনেক পরিবার পুরুষানুক্রমে এই অঞ্চলের আদিবাসী। নবীন পট্টনায়ক সরকার কোন কিছুই স্বীকার করতে চায় নি। সরকারি জমিতে তাদের যা খুশি করার অধিকার আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ, আদতে যাদের সম্পত্তি, তাদের মতামত নিষ্প্রয়োজন, এটাই ছিল উড়িষ্যা সরকারের অভিমত। পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু তাই বনভূমি রক্ষার আন্দোলন।

পস্কো প্রকল্প রূপায়িত হতে পারে নি, তার একমাত্র কারণ, স্থানীয় মানুষের, বিশেষত ঢিনকিয়া, গোবিন্দপুর মানুষের, গত ছয় বছরের প্রতিরোধ আন্দোলন। এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করেই কেন্দ্রীয় সরকার ও তার পরিবেশ মন্ত্রক পরিবেশ আইন, অরণ্য সংরক্ষণ আইন, উপকূল নিয়ন্ত্রণ আইন, সেজ আইনে পস্কোকে একের পর এক ছাড়পত্র দিয়ে গেছে। গণশুনানিতে প্রকল্পভুক্ত অঞ্চলের মানুষকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ বেষ্টনীতে শুনানি করা হয়েছে, পরিবেশ অভিঘাত রিপোর্টে (EIA) তথ্য সংস্থান নিয়ে প্রচুর অভিযোগ আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এসবের প্রতি চোখ বুঁজে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিল।

কিন্তু বনাধিকার আইন, ২০০৬ চালু হওয়ার পর পস্কো প্রকল্পে নতুন এক বাধা উপস্থিত হয়। ২০০৭-এর জানুয়ারি মাসে বনাধিকার আইন, Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর, পস্কো প্রকল্প অঞ্চলেও ঐ আইন কার্যকর করার দাবি ওঠে। চলতি অবরোধ আন্দোলন আরও দানা বাঁধে এবং নবীন পট্টনায়কের সরকার এই আন্দোলনের প্রতি আরো বেশি মারমুখী হয়ে ওঠে। ২০০৭-এর নভেম্বরে পুলিশের গুলিচালনায় এবং ভাড়াটে গুন্ডার আক্রমণে কম করেও ৫০ জন আহত হয়। আন্দোলন মঞ্চ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

২০০৮-এর জানুয়ারি মাস থেকে বনাধিকার আইন সরকারিভাবে কার্যকর হয়। আইন অনুযায়ী ঢিনকিয়া পঞ্চায়েতের গ্রাম সভায় বনাধিকার কমিটি গঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ দপ্তর ৩ আগস্ট, ২০০৯ তারিখে নির্দেশ জারি করে যে, বনাধিকার আইনের প্রয়োগ সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং ন্যূনতম ৫০ শতাংশ ব্যক্তির উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সভার সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত অরণ্য জমির পরিবর্তন করার আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

এত কাণ্ডের পরেও, ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে, বনাধিকার আইন উপেক্ষা করেই কেন্দ্রীয় সরকার পস্কোকে অরণ্যভূমি পরিবর্তনের অনুমতি দেয়। প্রতিরোধ সমিতি এবং রাজনৈতিক দলগুলিও (বিশেষত সিপিআই) এই অনৈতিক আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি করায় ০৩/০৮/২০০৯ তারিখে পরিবেশ দপ্তরের তরফে ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, ঘোষিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত শর্তাবলী পূরণ না হলে, প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু বেআইনি আদেশ প্রত্যাহৃত হয় নি।

২০১০-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে প্রতিরোধ সমিতির নেতৃত্বে ধর্না শুরু হয়। একই সঙ্গে নুয়াগাঁও, ঢিনকিয়া, গোবিন্দপুর— তিনটি পঞ্চায়েতেই গ্রামসভা অরণ্যভূমি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু জগৎসিংহপুরের কালেক্টর সরকারকে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে জানায় বা তাকে দিয়ে লেখানো হয় যে উল্লিখিত তিনটি পঞ্চায়েতের সমস্ত অঞ্চলে বনাধিকার আইন অনুযায়ী দাবিগুলির মীমাংসা হয়েছে এবং ঐ অঞ্চলে কোন আদিবাসী বা অন্যান্য পরম্পরাগত বনবাসী (Other Traditional Forest Dweller) নেই বা তাদের তরফে সেইরকম কোন আবেদনও পেশ করা হয় নি। সরকারও বিনা বাক্যব্যয়ে সেই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রেরণ করেন।

মিথ্যা ঢাকার জন্য শুরু হয় পুলিশি অভিযান। ২০১০-এর মে মাসে সরকার পুলিসি সহায়তায় প্রকল্পভুক্ত জমি দখল নিতে সচেষ্ট হয়। আন্দোলনকারীদের উপর নেমে আসে নির্মম দমন-পীড়ন। ৫০জন মারাত্মকভাবে জখম হন। ধর্নামঞ্চ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। পার্লামেন্টেও রমেশ মশাইকে জবাবদিহি করতে হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার কিছুটা নড়েচড়ে বসে।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ দপ্তর এবং উপজাতি বিষয়ক দপ্তর যৌথভাবে বনাধিকার আইনের প্রয়োগ পর্যালোচনা করার জন্য সর্বশ্রী অরূপজ্যোতি সাইকিয়া, রবি রেব্বাপ্রাগরা এবং আশিষ কোঠারি-র সমন্বয়ে তিন সদস্যের একটি সমীক্ষক দল জাতীয় স্তরে গঠন করেছিল। ২০১০-এর জুলাই মাসে সমীক্ষক দলটি উড়িষ্যা সফরে যায়। জেলা প্রশাসনের অসহযোগিতা সত্ত্বেও সমীক্ষকরা বিভিন্ন তথ্য ও সাক্ষ্যের সাহায্যে, বিগত শতাব্দীর অন্তত দ্বিতীয় দশক থেকে ঢিনকিয়া বনাঞ্চলে পরম্পরাগত বনবাসীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। তাদের উত্তরপুরুষ হিসাবে বর্তমান আদিবাসীদের অনেকেই বনাধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করেছিলেন। কিন্তু প্রশাসন সেগুলিকে স্বীকার করে নি। সমীক্ষক দলের পর্যবেক্ষণ ছিল যে—

১) জেলা প্রশাসন যা বলছে, তা ঠিক নয়। পরম্পরাগত বনবাসীরা প্রকল্পভুক্ত বনাঞ্চলে বসবাস করে।

২) বনাধিকার আইনের প্রয়োগ সম্পূর্ণ হয় নি। কার্যত প্রাথমিক পর্বের পরে অগ্রসরই হয় নি। এ ব্যাপারেও জেলা প্রশাসনের বক্তব্য অসত্য এবং ভ্রান্তিমূলক।

৩) কয়েকটি পল্লীসভা অরণ্যভূমির পরিবর্তনের বিরোধিতা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং যতদূর বোঝা যাচ্ছে এই প্রস্তাবগুলি পরিবেশ মন্ত্রকে পাঠানো হয় নি। ২০০৮ সালে যে বনাধিকার কমিটিগুলি গঠিত হয়েছিল, কেবলমাত্র সেই সিদ্ধান্তগুলি কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে।

সমীক্ষকদের মতামত যথাবিহিত অবহিত হওয়া সত্ত্বেও, জগৎসিংপুরের জেলা প্রশাসন বেপরোয়া ভাবে পান বরোজ ধ্বংস করে জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়। সমীক্ষার রিপোর্টে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রত্যাহার করে, পল্লীসভাগুলির সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত পস্কো প্রকল্পের সমস্ত কাজ বন্ধ করার সুপারিশ করা হয়। দেশের পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের এই রকম জোরালো অভিযোগ কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশকে কিছুটা বিপাকে ফেলে। কিছুটা নাচার হয়েই, পরিবেশ মন্ত্রক ২০১০-এর ৫ আগস্ট পস্কো প্রকল্পের জমিতে সমস্ত কাজ বন্ধের নির্দেশ জারি করে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বনাধিকার আইন অনুযায়ী বনবাসীদের পাট্টা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হল না।

পরিবেশ দপ্তর আবার একটা কমিটি গড়ে রিপোর্ট দাখিল করতে বলে। পস্কো প্রকল্পে বনাধিকার আইনের প্রয়োগ এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করার জন্য ২৮ জুলাই, ২০১০ তারিখে প্রাক্তন পরিবেশ সচিব শ্রীমতী মীনা গুপ্তার নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। অক্টোবর মাসে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। চার সদস্যের কমিটিতে কমিটি-প্রধানই ছিলেন সংখ্যালঘু। ড. উর্মিলা পিঙ্গলে, ড. দেবেন্দ্র পান্ডে, ডঃ ভি সুরেশ পৃথকভাবে সংখ্যাগুরুর মতামত পেশ করেন। সুপারিশের ক্ষেত্রে যাই পার্থক্য থাকুক না কেন, একটা বিষয়ে সকলেই সহমত ছিলেন— এ যাবৎকাল উড়িষ্যা সরকার তথ্য গোপন করে অসত্য রিপোর্ট পেশ করে গেছে। কমিটির সংখ্যাগুরু অংশ পস্কোকে প্রদত্ত সমস্ত অনুমতি পত্র অবিলম্বে বাতিলের সুপারিশ করে বনাধিকার আইন সহ সমস্ত প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন (The Committe therefore strongly recommends that the final forest clereance referred above be revoked forthwith etc... Envoronmental Clearance given by the MOEF dt 15.5.2007 for minor port and 19.7.2007 for the steel plant should be immediately revoked forthwith etc.)

শ্রীমতী গুপ্তা বাতিলের সুপারিশ না করলেও, পরম্পরাগত বনবাসীদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে, বনাধিকার আইন অনুযায়ী নতুন করে সংশ্লিষ্ট গ্রামসভাগুলির সম্মতি গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন (However it is possible that there are other traditional forest dwellers in the area, and that they have genuine documents to prove cultivation and dependence on forest land for more than 75 years... The exercise of inviting claims from the villagers of 8 project affected villages for recognition of forest rights should be undertaken afresh)।

আর একটি উপেক্ষিত বিষয়ের প্রতিও গুপ্তা কমিটির রিপোর্ট নজর দেয়। জটাধরমোহন খাঁড়িতে পস্কোর নিজস্ব বন্দর প্রকল্প অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে উড়িষ্যা সরকার কোন গুরুত্বই দেয় নি। রাজ্য সরকারের মতে একমাত্র 'নোলিয়া শাহী' গ্রামের কয়েকজন মৎস্যজীবী ব্যতীত আর কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। কমিটির কাছে যে অগুনতি আবেদনপত্র জমা পড়ে, তা থেকে দেখা গেল, উড়িষ্যার প্রাচীন বর্ধমান রাজবংশ প্রদত্ত সনদ মূলে কুজঙ্গ জায়গীরভুক্ত ৯৯টি গ্রামের কৈবর্ত সম্প্রদায় ৫৭টি নদী ও খাঁড়িতে সুদূর ১৮৬০ সাল থেকে বংশ পরম্পরায় মাছ ধরার অধিকার ভোগ করে আসছে। 'শহরাপেন্থা মাছাইরা' নামে এরা পরিচিত। প্রকল্পভুক্ত জটাধর মৌজাটিও ঐ জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত এবং সেখানেও এই সম্প্রদায় দীর্ঘকাল বসবাস ও জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। পস্কো বা রাজ্য সরকারের ক্ষতিপূরণ প্যাকেজে এদের উল্লেখও করা হয়নি।

ভূমিহীন কৃষকদের স্বার্থও উপেক্ষা করা হয়েছে। তাদের জীবিকার যথাযথ ক্ষতিপূরণের জন্যও কমিটির সুপারিশ ছিল।

সংখ্যাগুরু কিংবা সংখ্যালঘু, কারোর সুপারিশই মন্ত্রী এবং তাঁর দপ্তরকে খুশি করতে পারল না। দপ্তরের তিনটি সাব-কমিটি গুপ্তা কমিটির রিপোর্টের মূল সুপারিশগুলিকে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিল। মন্ত্রী জয়রাম রমেশ সমস্ত বিশেষজ্ঞ ও তদন্ত কমিটির রিপোর্টগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ৩১ জানুয়ারি

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

২০১১ প্রথম দফায় কয়েকটি শর্তের বিনিময়ে পস্কোর নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং বন্দরকে চূড়ান্ত পরিবেশ-ছাড়পত্র মঞ্জুর করলেন। মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন নিয়ে মন্ত্রীর আদেশে একটি কথাও বলা হলো না। তাদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও সম্পূর্ণভাবে পস্কোর হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো।

পস্কোকে বনভূমি হস্তান্তর ও পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত পাকা করা সত্ত্বেও সেদিনই তিনি আদেশ প্রকাশ করলেন না। রমেশ মশাই নোট দিলেন, "বনাধিকার আইনের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা ও রূপায়ণের প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারের"। মন্ত্রীমশাই তাই বনাধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যাপারে উড়িষ্যা সরকারকে গ্যারান্টি দিতে বললেন। এই সময়ক্ষেপের কারণ সম্ভবত একটাই। পূর্বোক্ত দুটি রিপোর্টেই পরম্পরাগত বনবাসীদের অস্তিত্ব এবং তাদের সম্মতি নেওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট করে অভিমত দেওয়া হয়েছিল। উড়িষ্যা সরকার কিছুতেই তাদের অবস্থান থেকে সরবে না। এই দাবি মানলে পুরো পস্কো প্রকল্পটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। প্রতিরোধ সমিতি প্রথমাবধি এই দাবিটাই করে এসেছে। সুতরাং, এই অপকর্মের দায়িত্ব নিজে না নিয়ে রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। ভাবমূর্তিটা বজায় রাখতে হবে তো!

ইতিমধ্যে, পরিবেশমন্ত্রীর ৩১ জানুয়ারির সিদ্ধান্ত জানার পর পস্কো প্রতিরোধ সমিতি পরিবেশ মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত এবং উড়িষ্যা সরকারের মিথ্যা ভাষণের প্রতিবাদ করে পরিবেশ মন্ত্রককে চিঠি পাঠায়। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢিনকিয়া ও গোবিন্দপুর বনাধিকার কমিটি জরুরি ভিত্তিতে পল্লীসভা আহ্বান করে এবং ৭০ শতাংশ গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে অরণ্য অঞ্চল রূপান্তরের প্রস্তাব বাতিল করা হয়। এই প্রস্তাবও কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক এবং রাজ্য প্রশাসনের সকল স্তরে প্রেরণ করা হয়।

১৩ এপ্রিল ২০১১ উড়িষ্যা সরকার জানিয়ে দেয় যে, প্রকল্প অঞ্চলে পরম্পরাগত বনবাসী কেউ নেই। বনাধিকার আইন প্রয়োগের ব্যাপারে উড়িষ্যা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে 'গ্যারান্টি' দেয়। ১৪ এপ্রিল রমেশ মশাই আবার নোট দিলেন, "উড়িষ্যা সরকার যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। কিন্তু ঢিনকিয়া ও গোবিন্দপুর বনাধিকার কমিটির সর্বশেষ যে দুটি প্রস্তাব ১১ এপ্রিল ২০১১ তারিখে পাওয়া গেছে সেগুলি সম্বন্ধেও রাজ্য সরকারের অভিমত জানা প্রয়োজন। এটা না করলে নাকি আইনের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হবে।"

উড়িষ্যা সরকার ঐ প্রস্তাব দুটিকে বেআইনি আখ্যা দিয়ে একেবারে উড়িয়ে দিল। ২৯ এপ্রিল উড়িষ্যা সরকার রিপোর্ট দেয় যে, মাত্র ৬৯ জন গ্রামবাসী ঢিনকিয়ার সভায় উপস্থিত ছিল। রাজ্য সরকার এবারও পরম্পরাগত বনবাসীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ঢিনকিয়ার সরপঞ্চ শিশির মহাপাত্রের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গের অভিযোগ আনে।

রাজ্য সরকারের অভিমত পাওয়ার পর ২ মে ২০১১ তারিখে মন্ত্রী জয়রাম রমেশ তাঁর আদেশে জানালেন,

"আমাদের সামনে তিনটি রাস্তা খোলা আছে-

১। রাজ্য সরকারের বক্তব্য প্রসঙ্গে পুনর্বার আইনজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ,

২। রাজ্য সরকার ও প্রতিরোধ কমিটির পরস্পরবিরোধী দাবি ও পাল্টা দাবি প্রসঙ্গে স্বাধীন তদন্ত অনুষ্ঠিত করা, অথবা

৩। রাজ্য সরকারের বক্তব্যে আস্থা স্থাপন করা।

আইনগত দিক আমি ইতিমধ্যেই বিবেচনা করেছি। আবার আইনজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে কিছুই লাভ হবে না। বিশেষত সরপঞ্চের গৃহীত প্রস্তাবে দুই-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামবাসীর স্বাক্ষরের অভাবে, এতদতিরিক্ত তদন্ত বা যাচাই পরিহারের পক্ষে যথেষ্ট।

সুতরাং আমি তৃতীয় পথটি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ ২০০৬-এর বনাধিকার আইন প্রয়োগের প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারের— প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তা করা হয় গ্রামসভা, এসডিও, জেলা কালেক্টরের মাধ্যমে। এসডিও এবং কালেক্টরের রিপোর্টকে আমার মান্য করা উচিত। বিরুদ্ধে যদি প্রবল ও অকাট্য প্রমাণ না থাকে, তাঁদের ও রাজ্য সরকারের বক্তব্যই বহাল থাকবে। সুতরাং আমি মনে করি, বনাধিকার আইন ২০০৬ মোতাবেক ঢিনকিয়া ও গোবিন্দপুরে বনাধিকারের দাবির কোন আইনগ্রাহ্যতা নেই।

রাজ্য সরকার যা বলে, তার ওপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি প্রয়োজনীয় স্তম্ভ। সেই কারণেই আমি দ্বিতীয় পন্থা বাতিল করলাম। একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সবসময় প্রশ্ন তুলতে পারে না।"

এ যেন সেই বিচারকের গল্প। খুনির কাছে বিচারক জানতে চাইলেন, সে খুন করেছে কিনা। খুনি জানালো, সে অত্যন্ত সাত্ত্বিক মানুষ, সে খুন করতে পারে না। বিচারক খুনির সাত্ত্বিকতায় আস্থা স্থাপন করে তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। খোদ উড়িষ্যা সরকার যেখানে বিবাদি, সেখানে আস্থা-অনাস্থার প্রশ্ন ওঠে কী ভাবে। আর যদি ওঠে, তাহলে বলতে হয়, দেশের মানুষের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের 'বিশ্বাস ও আস্থা' নেই।

পস্কোকে দেশের অরণ্য সম্পদ ধ্বংস করার অনুমতি দেওয়ার জন্য জল অনেক ঘোলা করতে হলো। এই জল ঘোলা করার অধিকারটুকুই গণতন্ত্র দেশের মানুষকে দিয়েছে। গণতন্ত্রে কিন্তু সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই (ভোট বাক্সটুকু ছাড়া, কখনও কখনও তাও নয়)। উন্নয়ন চলবে পুঁজির কথায়, সরকার চলবে পুঁজির আদেশে, তুমি-আমি-দেশ চলব সরকারের আদেশে। আমার জমি তুমি নেবে, আমার মত নেওয়ার দরকার নেই। আমার উন্নয়ন তুমি ঠিক করে দেবে,

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

আমার কথা বলার অধিকার নেই। এর পরে আমাকে ক্ষেপে উঠতে হয়, সে রাস্তাটাই একমাত্র খোলা। ক্ষেপে উঠলে, দেখেছি, কিছুটা সমীহ আদায় করা যায়।

পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি প্রতিরোধ কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সংগ্রাম সমিতির সভাপতি অভয় সাহু একটি সংসদীয় বামপন্থী দলের সদস্য। কিন্তু সংসদের ভিতরে-বাইরে সেই দলটিকে পস্কো বিরোধী কোনো জোরালো কর্মসূচি গ্রহণ করতে দেখা যায় না। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিও একপ্রকার নিশ্চুপ। কাজেই সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়ে, প্রতিরোধ সমিতিকে লড়াইটা কি একাই লড়তে হবে?

চূড়ান্ত আদেশে রমেশ মশাই উড়িষ্যা সরকারের প্রতি একটি বিনীত অনুরোধ রেখেছেন। মৌ নবীকরণের সময় বিদেশে ঐ আকর রপ্তানির শর্তটি যেন বাদ দেওয়া হয়। আর হ্যাঁ, আর একটি বিষয় যুক্ত করেছেন, 'বেআইনি সভা ডাকার অপরাধে' ঢিনকিয়ার সরপঞ্চের বিরুদ্ধে উড়িষ্যা সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। রমেশ মশাইকে নমস্কার।

প্রণব দে

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ও আন্না হাজারে

সম্প্রতি দিল্লীর যন্তর মন্তরে গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারে-র নেতৃত্বে পরিচালিত দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন সারা দেশের অন্তত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন তৈরি করেছে। সমস্ত সংবাদ-মাধ্যম এই ঘটনাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছে। আন্নার কৃতিত্ব এটাই যে, যখন একের পর এক কালামাদি-টুজি স্পেকট্রাম প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বিভিন্ন দুর্নীতির কাহিনী সারা দেশে প্রায় বিবমিষার প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই আঘাত হেনে তিনি সহজেই বহু মানুষের সমর্থন অর্জন করতে পেরেছেন।আর এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উত্থাপিত মূল বিষয়টি যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও সময়োপযোগী, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। এটা তো ঘটনা যে, প্রাসঙ্গিক লোকপাল বিলটি ১৯৬৮-তে লোকসভায় গৃহীত হলেও, রাজ্যসভায় প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এবং তার পর আটবার একে সংশোধিত আকারে আবার তোলা হলেও, আজ পর্যন্ত তা গৃহীত হয় নি। এই প্রেক্ষিতেই আন্না দাবি তুলেছিলেন, অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এই বিল গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং তার খসড়া তৈরির কাজে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের (আন্না-মনোনীত) সমান মর্যাদা দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সরকার প্রথম দিকে কিছুটা অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দিলেও শেষ পর্যন্ত মীমাংসার পথেই এগিয়েছে।

আন্না হাজারে-র নেতৃত্বে পরিচালিত দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের মৌলিক ন্যায্যতা স্বীকার করে নিয়েও এর মধ্যে দিয়ে উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের কিন্তু উত্তর মিলছে না। দুর্নীতি এমন একটি বিমূর্ত বিষয় নয় যে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমেই তার সমাধান হয়ে যাবে। এর সঙ্গে ক্ষমতায়ন ও গণতান্ত্রিক লক্ষ্যসাধনে ব্যভিচারেরও প্রশ্নটিও জড়িত। এটা যেমন ঘটনা যে, এ দেশে এই মুহূর্তে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মানুষকে কোনো না কোনো ভাবে দুর্নীতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, ঠিক তেমনি এটাও অনস্বীকার্য যে, এর উৎস সুনিশ্চিতভাবেই নিহিত রয়েছে বৃহত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকার মধ্যে। আর যে কোনো মানুষই উপলব্ধি ও স্বীকার করবেন যে, ১৯৪৭-উত্তর ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকাটি ক্রমশ, বিশেষত ১৯৯১-এ বিশ্বায়নের কর্মসূচি অনুসরণের পর থেকে ব্যাপকভাবে পাল্টে গেছে। সরকার কার্যত সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে, তথা কর্পোরেট সেক্টরের কার্যকর প্রতিনিধি হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাজার-অর্থনীতির প্রক্রিয়ায় প্রশাসন ও পুলিশ, জনপ্রতিনিধি ও বিচারকরা চরম দুর্নীতির গভীর পাঁকে নিমজ্জিত হচ্ছে, এবং এই সমগ্র প্রক্রিয়ার শিকার হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে নিচু তলার মানুষেরা। অথচ মজার কথা বিশ্বায়নের পান্ডারা পাবলিক সেক্টরের বিরোধিতা করে তার বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে; অথচ আজ প্রমাণিত হচ্ছে, দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় পাবলিক সেক্টর প্রাইভেট সেক্টরের তুলনায় লক্ষ যোজন পিছিয়ে আছে বা ছিল। আন্না হাজারে ও তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গীরা সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকা ও দুর্নীতির মধ্যেকার এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটিই ধরতে পারছেন না, বা ধরতে চাইছেন না। তাই দুর্নীতির মূল উৎসকে সমূলে উৎপাটিত করার ব্যাপারে সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা করতে বা কর্মসূচি নিতে তাঁদের গভীর অনীহা।

ফলত ব্যাপকসংখ্যক মধ্যবিত্তদের পাশাপাশি কর্পোরেট হাউসের পান্ডা, শহুরে 'সোসাইটি'-র অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যমণি, ধর্মীয় গুরু, কিছু রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতিদেরও আন্নার আন্দোলনে সামিল হতে বাধা হয় নি— যাদের অনেকেই সেই পটভূমিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, যাদের অনেকের বিরুদ্ধেই আয় কর ফাঁকি সহ নানা অভিযোগ রয়েছে। আন্না শুধু তাদের সমর্থনই নেন নি, অনেককে আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মঞ্চে পর্যন্ত সসম্মানে আসন দিয়েছেন।

এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুজরাটের সাম্প্রদায়িক গণহত্যার মূল পান্ডা নরেন্দ্র মোদিকে পর্যন্ত 'গ্রামীণ উন্নয়ন'-এর মডেল হিসেবে অভিহিত করে মঞ্চে তুলেছেন। এই ঘটনাটি এমনকি এই আন্দোলনের অন্যতম মূল শক্তি নাগরিক সমাজের ও অধিকার আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মীদের পর্যন্ত চরম বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। বাদ পড়েন নি ধর্মগুরু বাবা রামদেব, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতা রাম মাধব প্রভৃতিরাও। আর নৈবেদ্যের চূড়া হিসেবে আন্দোলনের মঞ্চে জ্বলজ্বল করেছে হিন্দু ধর্মীয় জারক রসে জারিত 'ভারতমাতা'-র ছবি। স্পষ্ট হয়ে গেছে: কেন তিনি

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

গান্ধীবাদী কায়দায় আজীবন অনশনের হুমকি দিতেই সমাজের উচ্চতম স্তরের সবার, বিশেষত সংবাদ-মাধ্যমের এতো ব্যাপক সমর্থন পেয়েছেন, অথচ মণিপুরের ইরম শর্মিলা দীর্ঘ দশ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনশনে থাকলেও মিডিয়াতে তাঁর উপস্থিতি প্রায় বিরল ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লড়াই-এ নাগরিক সমাজকে পুঁজিবাদী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গণ হিসেবে ব্যবহার করার তত্ত্ব তুলে ধরেছিলেন গ্রামশি। কিন্তু স্পষ্টতই বলে দেওয়া দরকার যে, আন্না-র আন্দোলনই যদি তার বাস্তব চেহারা হয়, তবে, শেষ বিচারে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বা তার ধারক-বাহকদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না।

দামিনী চৌধুরী

মিশর-বিপ্লব কোন্ পথে?

মিশর বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়ায় মুবারক জমানার অবসানের পর প্রায় একশো দিন কেটে গেলো। এই সময়কালে কোন্ পথে চলেছে সেই বিপ্লব? পশ্চিমা সংবাদ-মাধ্যম অবশ্য ইতিমধ্যেই তার মৃত্যুঘন্টা প্রায় বাজিয়ে দিয়েছে (*নিউইয়র্ক টাইমস্* প্রশ্ন তুলেছে: 'আরব বসন্তের কি অবসান ঘটছে?')। আর মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব হিলারি ক্লিন্টন তো নিদানই হেঁকে বসেছেন যে, 'মরীচিকাই হচ্ছে এই বিপ্লবের পরিণতি'!

বাস্তব তথ্য কিন্তু এই সব হতাশাব্যঞ্জক সম্ভাবনার প্রমাণ দিচ্ছে না। যারা তাহিরি স্কয়ারের দুনিয়া-কাঁপানো ঘটনাবলীর জন্ম দিয়েছিল, সেই শ্রমিক-ছাত্র-নারী মোর্চাগুলি এবং তুলনামূলকভাবে মুক্তমনা ইসলামিক যুবগোষ্ঠীগুলি আগের মতোই তাদের সক্রিয়তা বজায় রেখেছে। তাদের প্রতিরোধের ফলেই টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলির কর্তৃত্ব থেকে ঘাপ্‌টি-মেরে-থাকা মুবারকপন্থীরা অধিকাংশই বিতাড়িত হয়েছে; ব্যাপক-ঘৃণিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও পুলিশি মন্ত্রকের ঝাঁপ এই মুহূর্তে প্রায় বন্ধ; পুলিশি নির্যাতন, দুর্নীতি ও ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতার অপনায়কদের বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিরোধের ধারাবাহিকতা চলছেই। নতুন কিছু রাজনৈতিক গোষ্ঠী জন্ম নিচ্ছে, নারীদের অধিকার খর্ব করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জোরদার হচ্ছে, শ্রমিক ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে । মিশরের ইতিহাসে এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদ, পেশাজীবীদের সংগঠন ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলিতে প্রকৃত অর্থে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মুবারক বন্দী, তার ছেলেরা তোরা জেলে আটক, কয়েকটি বড়ো অলিগার্কির সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। ফলত অন্তত এখনও মিশর বিপ্লবকে খরচের খাতায় তুলে দেওয়ার কোনো যুক্তি মিলছে না।

এই নৈরাশ্যবাদীরা (উদ্দেশ্যপ্রণোদিত?) অবশ্য দোহাই দিচ্ছে ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত রেফারেন্ডামের, ৭৭ শতাংশ ভোটার যখন তাড়াহুড়ো করে মূলত সেনাবাহিনী ও মুসলিম ব্রাদারহুডদের মাতব্বরদের তৈরি সাংবিধানিক সংশোধনী প্রস্তাবকে, বামপন্থী, উদারতাবাদী ও খৃস্টান সংগঠনগুলির বিরোধিতা সত্ত্বেও, সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু এই ভোটকে প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে ও সেনাবাহিনীর পক্ষে সমর্থন হিসেবে দেখার কোনো অবকাশ নেই (কেন, একটু পরেই আমরা সে-প্রসঙ্গে আসবো)— একে বরং দেখা উচিত নতুন একটা অবাধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন হিসেবেই।

বস্তুত রেফারেন্ডামের পরে পরেই সামরিক শাসনের চাপিয়ে দেওয়া দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তথা সেনাবাহিনী ও মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে বিরাটভাবেই ফেটে পড়েছিল বিক্ষোভের ব্যাপক কর্মসূচি— বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, দক্ষিণের গ্রামাঞ্চলে, শহরের পথে পথে। এমনকি বিরোধিতার প্রকাশ ঘটেছিল সেনাবাহিনীর মধ্যে এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের তরুণ ও তুলনামূলকভাবে মুক্তমনা ইসলামিক যুবগোষ্ঠীর মধ্যেও। সেনাবাহিনীর উপর চাপ তৈরি হচ্ছিল বিপ্লবী যুবসমাজের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াবার জন্য।

এরই চরম প্রকাশ ঘটেছিল ৮ এপ্রিল শুক্রবার আহূত বিশুদ্ধিকরণ দিবসে— মিটিং-মিছিল নিষিদ্ধ করে জারি করা নতুন সামরিক আইনের বিরুদ্ধে, এবং জরুরি অবস্থা দীর্ঘায়ত করার ও মুবারকের প্রতি নমনীয় অবস্থানের ইঙ্গিতেরও বিরুদ্ধে তাহিরি স্কয়ারে হাজার হাজার ছাত্র, মহিলা ও এমনকি ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির বিক্ষোভ-সমাবেশের মধ্যে দিয়ে। মিটিং-মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা হাজারে হাজারে মিছিল করে এসেছিলেন। সেখানে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছিলেন শ্রমিকরা, মুসলিম সিস্টারহুডের সদস্যরা, এমনকি সামরিক পোষাকে সজ্জিত কুড়ি-তিরিশজন তরুণ সামরিক অফিসারও। সেখানে দমনমূলক আইন ও জরুরি অবস্থা তুলে নেবার দাবি এবং সৈন্যদেরকে স্পষ্টভাবে জনগণের পক্ষে অবস্থান নেবার অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তরুণ সামরিক অফিসাররা বিশেষভাবে সোচ্চার হয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও মুবারকের চ্যালা-চামুন্ডাদের সেনাবাহিনী থেকে অপসারণের দাবিতে। সেদিন রাতেই সামরিক পুলিশ ও বহু-ধিকৃত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রতিবাদীদের উপর। তাদের গুলিতে একজন তরুণী-সহ দু'জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। অধিকাংশ তরুণ সামরিক অফিসারদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার এবং কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছিল।

কিন্তু কায়েমি স্বার্থের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের পক্ষে গণপ্রতিবাদের ঝড়কে প্রতিহত করা সম্ভব হয় নি। বরং ঠিক তার পরের দিন শনিবার সকালেই ফেটে পড়েছে আরও সোচ্চার ও আরও বলিষ্ঠ প্রতিবাদের টাইফুন। অনেক বেশি

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

সংখ্যক মানুষের সমাবেশ ঘটেছে এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। শ্রমিক-ছাত্র-যুবক-মধ্যবিত্তরা তো ছিলেনই, ছিল সমস্ত রাজনৈতিক দলের লোকেরা, এমনকি মুসলিম ব্রাদারহুড পর্যন্ত। ফলত রবিবারের মধ্যে মুক্তি দিতে হয়েছে গ্রেপ্তার হওয়া সমস্ত প্রতিবাদীদের। সামরিক শাসকদের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটাবার। জনগণের পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিবাদী বেশ কয়েকজন সামরিক অফিসারকে উচ্চতর পদে পুনর্বাসিত করতে হয়েছে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এটাই যে, রেফারেন্ডাম-উত্তর সংকটের প্রেক্ষিতে সংগঠিত হয়েছে একটি নতুন সংগঠন— মিশরীয় জাতীয় কংগ্রেস, বা বিপ্লব-রক্ষাকারী মিশরীয় কংগ্রেস (Egyptian Congress to Defend the Revolution)— ২৫ জানুয়ারির যুবমোর্চা, ৬ এপ্রিলের জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন, প্রগতিশীল যুব লিগ, উত্তর মিশরীয় গ্রামীণ যুব মঞ্চ প্রভৃতির সমাহারে গড়ে ওঠা এক ঐক্যবদ্ধ যুক্তমোর্চা। এর মধ্যে আছে এমনকি খৃস্টানদের সমর্থিত যুবকবৃন্দও। ঠিক হয়েছে, খুব শিগগিরই সমস্ত শক্তি মিলে সামরিক পর্ষদের বিপরীতে একটি পরিচালক সমিতি গড়ে তুলবে, এবং বিপ্লবের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি ঘোষণাপত্র তৈরি করবে। উল্লেখ্য যে, মুসলিম ব্রাদারহুড এই যুক্তমোর্চায় যোগ না দিয়ে বিকল্প একটি মোর্চা ('জাতীয় সংলাপ') গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রবীণ কয়েকজন সামরিক পদাধিকারী এবং মুবারকপন্থীদেরও অনেকে।

ইতিমধ্যে কিছুদিন আগে পর্যন্তও যে ছাত্রদের ব্যাপক অংশই ছিলেন 'অ-রাজনৈতিক', এখন তারা বিপুল সংখ্যায় রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছেন। ছাত্রসংসদের নির্বাচনে বিরাট বিতর্ক গড়ে উঠছে কী ধরনের সরকার বা সমাজ তারা চায় তা নিয়ে। মুসলিম ব্রাদারহুড তাদের মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদের বিস্তার ঘটাবার চেষ্টা করে তেমন সুবিধে করতে পারছে না। সুবিধে হচ্ছে না খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় জিগির তুলেও। বরং ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যেও ক্রমশ সম্পৃক্ত হয়ে উঠছে আগামী দিনের মুক্তমনা গণতান্ত্রিক সমাজভাবনা।

একই রকমভাবে রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল ভাবনাচিন্তার প্রকাশ ঘটছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সাংবাদিক, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি পেশাজীবীদের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যেও। প্রাচীনপন্থীদের বিরোধিতাকে উড়িয়ে দিয়ে ডাক্তারদের সংগঠনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাহিরি স্কয়ারে আন্দোলন চলাকালীন নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে তিন হাজার মিশরীয় পাউন্ড করে সাহায্য দেবার । গঠিত হয়েছে ৮০ লক্ষ পেশাজীবীদের ঐক্যবদ্ধ যুক্তমোর্চা '৯ মার্চ আন্দোলন'। এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ধর্মঘটের কর্মসূচি নিয়েছেন ডাক্তার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও।

মধ্যবিত্ত সমাজের যুব ও পেশাদাররা যখন আরও বেশি সক্রিয়তা ও সঙ্ঘবদ্ধতার পরিচয় দিচ্ছেন, তখন মূলত যাদের উপর ভিত্তি করে বিস্ফোরিত হয়েছিল মিশরের সাম্প্রতিক বিপ্লব, সেই শ্রমিকেরাও পিছিয়ে থাকেন নি। আরব সংবাদপত্র *আল মাসরি আল ইয়োম* সম্প্রতিকালে একটি কাজের দিনে নীল নদীর আশেপাশের ছোটো শহর ও কারখানাগুলির শ্রমিক ধর্মঘটগুলির একটি রোজনামচা প্রকাশ করেছে। তাখলা শহরের ৩৫০ গ্যাস-বন্টনকারী, ঘারবিয়াতে ১২০০ ব্যাংক-কর্মচারী, মনুফিয়াতে ৩০০ পোট্যাটো-চিপ কারখানার শ্রমিক, বেহেরিয়াতে ১০০ নার্সিং কর্মচারি, মহসামাতে রুটিতে অনুদান বন্ধের বিরুদ্ধে ১৫০০ শ্রমিক, আসিউটের সুতোশিল্পের শ্রমিকরা, আলেকজান্দ্রিয়াতে শিক্ষাকর্মীরা এবং কায়রোর শিক্ষামন্ত্রকের কর্মীরা বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘট বা অবস্থান চালাচ্ছেন। ওই সংবাদপত্রই খবর দিচ্ছে: মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ধর্মঘট করছেন ৩০০০ আসবাবপত্র শ্রমিক কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে; আনশাস শহরের এক ও দুই নম্বর পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের শ্রমিকেরা মজুরিবৃদ্ধির ও কাজের নিরাপত্তা জোরদার করার দাবিতে; সাদাত শিল্পনগরের সেরামিক কারখানার শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধি এবং চিকিৎসার দাবিতে; আবু সিম্বেলের বিমানবন্দরের শ্রমিকেরাও একই দাবিতে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তোরা গ্লুকোজ কোম্পানির শ্রমিকেরা বিভিন্ন দাবিদাওয়াতে।

গণসংগ্রামের যতো তীব্রতা বাড়ছে, ততোই চাপে পড়ে যাচ্ছে সামরিক শাসকেরা। দেশের শাসকশ্রেণী ও আন্তর্জাতিক পুঁজির স্বার্থে মিছিল-মিটিং নিষিদ্ধ করেও ফল হচ্ছে না, সংগ্রামী মানুষ প্রতিনিয়ত সেই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করছে। হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার ও দমন-পীড়ন চালিয়েও তা প্রশমিত করা যাচ্ছে না। কিন্তু জনগণের রুদ্ররোষের ধারাবাহিকতা দেখে তারা সম্মুখ সমরে যেতে ইতস্তত করছে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ওই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে পারছে না। যদিও নানা ভাবে তাদের চরম দমন-নিপীড়নের পথে যাবার প্রস্তুতির ইঙ্গিত মিলছে। বাস্তব অবস্থাটা সঠিকভাবে ধরা পড়েছে প্রবীণ এক মুসলিম ব্রাদারহুড নেতার সবিস্ময় উক্তিতে : এ এক বিচিত্র গণতন্ত্র! সবাই ভাবছে, সে একজন চে গুয়েভারা, কাস্ত্রো বা ওইরকম কিছু একটা হয়ে গেছে!

স্বভাবতই এই পরিস্থিতিকে এক কথায় মিশর বিপ্লবের বসন্তের হাওয়ার অবসান বলে ধরে নেওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

❑ এই নিবন্ধের তথ্যগুলি সংগৃহীত হয়েছে countercurrents.org, mrzine.monthlyreview.org, kafila.org, zcommunications.org/zmag, Update@ socialistaction. net এবং wsws.org, প্রভৃতি ওয়েবসাইট থেকে

দীপ্র চৌধুরী

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ফুকুসিমা — এখন কেমন?

"আমরা বিশ্বায়ন-পন্থী এই সমস্ত মানুষগুলোকে দুনিয়া চালাতে দিতে পারি না। পৃথিবীর মানুষ চোখ খুলে দেখুক এরা কী কাণ্ডই না করছে। এরা মৃত্যুর পূজারী, এরা মৃত্যুর কথা ক্রমাগত অস্বীকার করছে— এদের পৃথিবী শাসনের কোনও অধিকার নেই।"

—ইয়োচি সিমাৎশু

(জাপান টাইমস্-এর প্রাক্তন সম্পাদক। নিউক্লিয়ার নীতির সমালোচনা করার জন্য পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।)

জাপানের ওপর মার্কিন দেশের নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত কারণে বেশ কয়েক প্রজন্মের মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন— বিকলাঙ্গতা ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আজও বহু শিশু জন্মগ্রহণ করছে সেখানে।

এখন শান্তির সময়। 'শান্তি ও শক্তির জন্য পরমাণু'-র প্রয়োজন বলে মার্কিন দেশ সহ ইউরোপের নানান দেশের শাসকরা জোর গলায় সওয়াল করছেন। জাপানেও তার প্রত্যাশিত প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

ফুকুসিমা-র নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের দুর্ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের চরিত্র যুদ্ধ বা শান্তির ওপর নির্ভর করে না। ফলত, প্রতিটি নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রই বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষমান একেকটি টাইম বোমা।

রাশিয়ায় চের্নোবিলের নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রে বিস্ফোরণ ঘটার পর প্রায় ১৮০ জন কর্মী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুর্ঘটনা সামাল দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের দেহে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ আছড়ে পড়ে, তার ফলে তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যতিক্রমহীন ভাবে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে তিনমাসের মধ্যে প্রাণ হারান। বর্তমানে সেই মৃত্যুর সংখ্যা কয়েক লক্ষ ছাড়িয়েছে।

ফুকুসিমার ক্ষেত্রেও সেই একই বিয়োগান্তক নাটকের পুনরাভিনয় হলো। 'হারাকিরি'-র জন্য খ্যাত জাপানে ফুকুসিমার কারিগরি বিভাগের ১৮০ জন কর্মী বিকিরণ-এর তীব্রতা কমানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ফুকুসিমা ডাইচি-র কেন্দ্রগুলোতে বিকিরণের পরিমাণ এতই বেশি ছিল যে, একাদিক্রমে ১৫ মিনিটের বেশি থাকলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু প্রায় অবধারিত। তাই এই ১৮০জন কর্মী ৫০জনের এক একটি গোষ্ঠী গঠন করে নিউক্লিয়ার জঞ্জাল সাফাই করছেন। জাপানের মানুষ এঁদের নাম দিয়েছেন 'ফুকুসিমা-৫০'। জাপানি বিশেষজ্ঞদের মতে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ বিকিরণের ফলে মানবদেহে ক্যানসার হওয়া অবধারিত, বর্তমানে ফুকুসিমা এবং তার আশেপাশে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা তার চারগুণ।

আগুন নেভানো এবং তেজস্ক্রিয়তা আটকানোর জন্য জল ছেটানোর কাজে জাপান সরকার তিনটি 'চিনুক-৪৭' হেলিকপ্টার ব্যবহার করেছে। চের্নোবিল দুর্ঘটনার সময়ও হেলিকপ্টার থেকে একই উদ্দেশ্যে বালি ছেটানো হয়েছিল। চের্নোবিলে যে সমস্ত চালক এবং কর্মীরা বালি ভর্তি হেলিকপ্টারে ছিলেন— ঘটনার ২২৫ দিনের মধ্যে তাঁরা প্রত্যেকেই তীব্র ক্যানসার রোগে প্রাণ হারান। ফুকুসিমার ঘটনার পর ৬-৭ সপ্তাহ অতিক্রান্ত, হেলিকপ্টার চালক এবং কর্মীদের দেহে রক্তের ক্যানসার ধরা পড়েছে।

ফুকুসিমার থেকে ৫০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত গাছপালায় যে ধরনের জিনঘটিত পরিবর্তন (মিউটেশন) দুর্ঘটনা ঘটার ৫ সপ্তাহের মধ্যেই ধরা পড়েছে, তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বিকিরণের তীব্রতা নাগাসাকি-হিরোসিমার তুলনায় অনেক বিস্তৃত— এই তীব্রতা অন্তত লক্ষগুণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। এক ধরনের পাখির লেজ বিকিরণজনিত কারণে খসে পড়ছে। তাই তারা প্রজনন-অক্ষম হয়ে গেছে। এমনিতে এই পাখির প্রজাতিটি জাপানের একান্ত নিজস্ব প্রজাতি। তাদের সংখ্যা বাড়তির দিকে ছিল। কিন্তু ফুকুসিমা-র দুর্ঘটনা এই পাখিটিকে বিপজ্জনক প্রজাতি করে তুললো। অদূর ভবিষ্যতে কেবলমাত্র এই বিকিরণের কারণেই এই পাখির প্রজাতিটি লুপ্ত হয়ে যাবে সন্দেহ নেই!

বিজ্ঞানীদের সমস্ত সাবধানবাণী উপেক্ষা করে জাপান সরকার ফুকুসিমার আগুন নেভানো এবং ফুরিয়ে যাওয়া জ্বালানী দণ্ড ঠাণ্ডা করার জন্য সমুদ্রের জল ব্যবহার করে। ব্যবহার করা সেই সমুদ্রের জল তীব্রভাবে তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সাগরবাহিত হয়ে সেই তেজস্ক্রিয়তা এমনকি মার্কিন মুলুকেও হাজির হয়েছে। জাপানী জীববিজ্ঞানীদের মতে এই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে সমুদ্রে বসবাসকারী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বড় অংশটাই অবলুপ্ত হবে, ঠিক যেমন পুরোনো প্রস্তর যুগের সময় সামুদ্রিক শুশুক, প্রায় সমস্ত জাতের তিমি মাছ, রোমশ ম্যামথ হাতি, দাঁতালো বাঘ প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে! তবে তারা অবলুপ্ত হয়েছিল হাজার-লক্ষ বছর ধরে, প্রাকৃতিক নিয়মে, আর এদের অবলুপ্তি ঘটবে কয়েক বছরের মধ্যে, মানুষের সীমাহীন লোভের কারণে।

ফুকুসিমা দুর্ঘটনার প্রায় ৬ সপ্তাহ পর মৃত্যুর মিছিলের দিকে তাকানো যাক। না, ক্যানসারে মৃত্যুর জন্য আমাদের বছরের পর বছর, মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে না— 'ফুকুসিমা-৫০' গোষ্ঠীর প্রথম দলের ৫ জন মারা গেছেন এপ্রিলে শেষ সপ্তাহে, ১৫ জন রক্তের ক্যানসারে আক্রান্ত, ৩০ জনের দেহে 'ম্যালিগন্যান্ট কার্সিনোমা'-র প্রাথমিক লক্ষণ পরিস্ফুট। ফুকুসিমার ৩০ কিমি দূরত্বে অবস্থানকারী যে শিশুদের বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়েছিল, সেই বিদ্যালয়ের ১০০ জন শিশুর ঘন ঘন রক্তবমন হচ্ছে— প্যানক্রিয়াস-এ উচ্চমাত্রায় তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম মৌলের উপস্থিতির কারণে!

চের্নোবিলের ওপর এখন খুব উচ্চমানের ডাক্তারি সমীক্ষা

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

পাওয়া যায়। যে রাশিয়ান বিজ্ঞানী সরকার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে ১৯৮৬ থেকে আজ পর্যন্ত এই ডাক্তারী সমীক্ষা চালাচ্ছেন, তিনি জাপানে তেজস্ক্রিয়তাজনিত মৃত্যুর একটা হিসেব কষেছেন। তাঁর হিসেবের ভিত্তি হলো চের্নোবিলের অবস্থার সঙ্গে তুলনা-প্রতিতুলনা। তাঁর হিসেব মতে আগামী তিনমাস থেকে দু'বছরের মধ্যে জাপানের ৪ লক্ষ অধিবাসী ক্যানসারে আক্রান্ত হবেন, যাঁদের অন্তত ৬২ শতাংশ আগামী তিন বছরের মধ্যেই প্রাণ হারাবে করবে।

শেষ করার আগে যা বলার তা হলো, জাপান যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়ে মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সেই যুদ্ধে হিরোসিমা-নাগাসাকির নিউক্লিয়ার বোমার তেজস্ক্রিয় বিকিরণে কমবেশি ২.৫ লক্ষ মানুষ আজ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন। আর ফুকুসিমা ঘটেছে সম্পূর্ণ শান্তির সময়ে, কোনও বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণের জন্য নয় এবং এই ক্ষেত্রে মৃত্যুর পরিমাণ যুদ্ধের সময়ের দু'গুণ। নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র তা হলে কি এক গোপন নিউক্লিয়ার বোমা নয়? শান্তির জন্য পরমাণু আর যুদ্ধের জন্য পরমাণুর সীমারেখাটা অদৃশ্যপ্রায়। ভারতের নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্রের জন্য এই একই যুক্তি প্রযোজ্য। হরিপুর কবে ফুকুসিমা হবে আমরা এখন তার দিন গুনি!

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকারের লড়াই তীব্রতা পাচ্ছে

১৯৭১-এ জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে অনেক লড়াই আর রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ। স্বভাবতই অনেকের প্রত্যাশা ছিল : সেদেশে অন্তত সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগুরুদের জাতিগত নিপীড়নের বিষাক্ত সাপ ফণা তুলবে না। কিন্তু বাংলাদেশেও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিয়ম অনুসারে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুরা জাতিগত বিভেদের শিকার চলতে বাধ্য এবং শ্রেণী-শোষণ ও নির্যাতনের পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত থাকার কারণে শাসকশ্রেণীর কারাগারে তারা সবাই বন্দী। শোষিত ও নির্যাতিতরা সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু যে জাতিরই হোক, শাসকশ্রেণীর শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে তাদের মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই। কাজেই যে জাতি সংখ্যাগুরু হিসেবে সংখ্যালঘু জনগণের ওপর নির্যাতন চালায় তারা নিজেরাও প্রকৃত অর্থে মুক্ত নয়। তাদের প্রকৃত মুক্তির জন্য সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই, শ্রেণী শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই। এই সত্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু বাঙালী জাতিভুক্ত জনগণকে সকল ভাষাগত ও জাতিগত সংখ্যলঘু জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শোষক-শাসকদের শাসন থেকে মুক্তির জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম সংগঠিত করা অত্যাবশ্যক একটি শর্ত। এ জন্য তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিক হওয়াটা একান্তই আবশ্যিক। আবার একই সঙ্গে এই লড়াইকে অতি অবশ্যই যুক্ত হতে হবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের সাথে।

এই বক্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করা যাবে সেদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অবস্থার দিকে ফিরে তাকালেই। বাংলাদেশে যে বাঙালী ছাড়া অন্য অনেক জাতির বসবাস আছে, তা নিয়ে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব এখনো পর্যন্ত দৃশ্যমান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অন্য জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রতি অস্বীকৃতি ও উপেক্ষার এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় থেকেই। বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে ১৩টি আদিবাসী জাতির বাস, সমতলভূমিতে রয়েছে ৪৫টিরও বেশি সংখ্যালঘু জাতিসত্তার মানুষ। সিলেট অঞ্চলে রয়েছে আরো কয়েকটি জাতিগোষ্ঠী। ভাষাগতভাবে বাংলাদেশে আছে বিহারী নামে পরিচিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী।

স্বাধীনতা অর্জনের পর আওয়ামী লীগ শাসন ক্ষমতায় সমাসীন হয়ে পাকিস্থানীদের মতোই জাতিগত নির্যাতন শুরু করে। এর কারণ প্রধানত নিহিত ছিল তাদের শ্রেণী চরিত্রের মধ্যে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বিহারী জনগোষ্ঠীর একাংশের পাকিস্থানী বাহিনীর দোসর হিসেবে ভূমিকা পালনের সূত্রে ঢালাওভাবে প্রথম নির্যাচন নেমে আসে এই জনগোষ্ঠীর উপর। বর্তমান বাংলাদেশে তারা জীবিকা-আবাস-শিক্ষার মতো মৌলিক অনেক বিষয় থেকে বঞ্চিত এক বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে টিকে আছে।

স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগেরই জনপ্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি প্রতিনিধি দল শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে জাতিগত সমস্যা এবং অধিকার বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করলে মুজিব সরাসরি তার বিরোধিতা করে বলেন যে, বাংলাদেশে বাঙালী ছাড়া অন্য কোনো জাতির কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। কাজেই তাদের অধিকার স্বতস্ফূর্তভাবে বিবেচনা করার প্রশ্ন ওঠে না।

শেখ মুজিবের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিভিন্ন জাতিসত্তার অধিকার তো নয়ই, এমনকি তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নি। পাকিস্থানি শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জাতিগত সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেও অন্যান্য জাতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, তাদেরকে সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় ফ্যাসিবাদী উগ্রতা নিয়ে। শাসকদের শ্রেণী অবস্থান ও উগ্র জাতীয়তাবাদী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই এমনটি ঘটেছিল। এ বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীর

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

মধ্যে মৌলিক পার্থক্য খুবই কম। এদের প্রত্যেকের শাসন আমলেই (জামায়াতে ইসলাম এককভাবে ক্ষমতায় আসেনি কখনো) সংখ্যালঘু জাতিরা নিপীড়িত জনগণের সব থেকে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্থ অংশ হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

১৯৭৫ সালে জেনালের জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত নিপীড়নের মাত্রা ও পদ্ধতিকে নতুন স্তরে নিয়ে যান। পাহাড়ি জাতিসমূহকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে সমতল এলাকার ভূমিহীন গরিবদেরকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সবাঙালী বসতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। জিয়ার পরে এরশাদের আমলে একই নীতি অনুসৃত হয়। জিয়াউর রহমান অনুসৃত এ প্রক্রিয়া পরবর্তী সরকারগুলোর আমলে অব্যাহত থাকে। এই দুই সেনাশাসকের আমলে সমগ্র পাহাড়ি অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে সেনা শাসন প্রবর্তিত হয়; যার অবসান কার্যত এখনো হয় নি।

সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেতে ব্যর্থ হয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্ব গঠিত হয় জনসংহতি সমিতি। সাংবিধানিক উপায়ে অধিকার আদায়ের পথ না থাকায় তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা অর্জনের পথ নেন। দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামের এক পর্যায়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে তারা অধীনতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তির বিরোধিতা করে তিনটি গণতান্ত্রিক সংগঠন গঠন করে এক নতুন দল ইউনাইটেড পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)। এই ইউপিডিএফ-ই এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসমূহের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে সেখানকার গণতান্ত্রিক এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামে সক্রিয় রয়েছে।

সংখ্যালঘু জাতিগুলোর মধ্যে একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসমূহই এখন রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত। তথাকথিত শান্তিচুক্তি সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনো শান্তি যে আসে নি সরকারের সামরিক বাহিনীর 'অপারেশন উত্তরণই' তার সব থেকে বড় প্রমাণ। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের ওপর নির্যাতন চলছে। সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম এ কারণেই অব্যাহত আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘু জাতিদের এই প্রতিরোধ যেভাবে আছে সমতল ভূমিতে সংখ্যালঘু জাতিলত্তার মধ্যে তা সেভাবে নেই। তৎকালীন পাকিস্থান সরকারের বিরুদ্ধে উত্তর বাংলার সাঁওতালদের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং ময়মনসিংহ ও সিলেটে হাজংদের সংগ্রাম ইতিহাস বিখ্যাত ও গৌরবজনক। কিন্তু বর্তমানে সমতলভূমিতে জাতিগত নির্যাতন-বিরোধী কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নেই। এ পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী অর্থায়নে বহু এনজিও এখন সমতলের সংখ্যালঘু জাতিভুক্ত লোকদের মধ্যে কাজ করছে। এরা আপাতদৃষ্টিতে এই নির্যাতিত জনগণের পক্ষে কাজ করলেও তাদের আসল উদ্দেশ্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন যাতে তাদের মধ্যে সংগঠিত হতে না পারে ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা যাতে সৃষ্টি হতে না পারে সেই চেষ্টা করা। এই উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তারা নিজেদের কর্মসূচি নির্ধারণ করে। এ কারণে দেখা যায় যে, নির্যাতন রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সংগঠিত না করে এনজিও, বিদেশি অর্থে প্রতিপালিত সিভিল সোসাইটি নামক সংগঠন ও বিদেশি দাতাসংস্থা নানা ধরনের মেলা, নৃত্য, গীত-সহ সাংগঠনিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করে তাদেরকে এক ধরনের অরাজনৈতিক অর্থাৎ কার্যত স্থিতাবস্থার পক্ষাবলম্বী সংগঠনের মধ্যে আটকে রাখে।

নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে কোনো সংগ্রামই যে মূলত রাজনৈতিক সংগ্রাম, এসব অরাজনৈতিকতার মাধ্যমে তাকে সুপরিকল্পিতভাবে আড়াল করার চক্রান্ত ধারাবাহিকভাবে চলছে। রাজনৈতিক সংগ্রামের কাঠামোর মধ্যে না যুক্ত হয়ে শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে শ্রমিকদের নিছক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করে রাখার প্রবণতা বিশেষভাবে ধরা পড়ছে বর্তমানে এনজিও-দের উদ্যোগে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে।

অথচ সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাই যাদের আছে, তাঁরাই জানে, শেষ বিচারে রাজনৈতিক লড়াই ছাড়া সংখ্যালঘু জাতিসমূহ-সহ সামগ্রিকভাবে শ্রমজীবী জনগণের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন অবসান সম্ভব নয়। আশার কথা, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে বৃহত্তর শ্রেণীসংগ্রামের প্রেক্ষিতে স্থাপিত করার ও এগিয়ে নিয়ে যাবার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি সাম্প্রতিককালে সচেতন ও প্রগতিশীল সমাজ-কর্মীদের ক্রমশ সক্রিয় করে তুলছে। প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-সহ জনগণবিরোধী সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে প্রাথমিক স্তরে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও কর্মী পেশাজীবী এবং সচেতন বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে মঞ্চ গড়ে তোলার।

এই প্রক্রিয়াকে সঠিক পথে ও যথোপযুক্ত কর্মসূচির ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার উপরই নির্ভর করছে এই লড়াইয়ের ভবিষ্যৎ।

নিজস্ব প্রতিবেদক

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

আমাদেরই সন্তান-সন্ততি

অশোক মিত্র

q কুখ্যাত জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-৭৭) পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। সে সময় বিশেষভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি। সেই নির্বাচনে মূল লড়াইটা ছিল কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের মধ্যে। বামফ্রন্টের মধ্যেও এই দাবিকে তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোর অন্তর্ভূক্ত করার দাবি উঠেছিল। সেই প্রেক্ষিতেই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল অশোক মিত্রের এই নিবন্ধটি। নিঃসন্দেহে তখন সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিকে মানুষের দাবি হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। বর্তমানের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বন্দীমুক্তির এই দাবি একই রকম প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষিত স্মরণে রেখে বর্তমান রচনাটি পুনঃমুদ্রিত করা হলো। q

আমাদেরই পুত্রকন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী। সারি-সারি সব বাঙালি নাম : কিষাণ চট্টোপাধ্যায় নয় তো ভারতী তরফদার অথবা সিরাজুল ইসলাম। আমাদেরই সন্তান-সন্ততি, বাঙালি স্বপ্নবিহ্বলতা তাদের চোখের অঞ্জন ছেয়ে এসেছিল। সবাই স্বপ্ন দেখেছিল তারা, দেশকে, সমাজকে মহত্তর, শ্রেষ্ঠতর করার স্বপ্ন। সবাই যে একই স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা নয়। আমরা, বিশেষ করে বাঙালিরা, একটু বেশিরকম সত্তা-সচেতন, আলাদা করে ভাবতে-বলতে-করতে ভালোবাসি, আমাদের দেখা স্বপ্নগুলিও তাই পরস্পরের থেকে ঈষৎ আলাদা হতে চায়। কিন্তু সব স্বপ্নেরই নিহিত মর্ম মোটামুটি এক : যুগ-যুগ ধরে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত যারা, তাদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এমন সমাজ গড়তে হবে যেখানে শোষণ নেই, অপশাসন নেই, সর্বস্তরের মানুষ সটান-সমান মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, দেশের যা সম্পদ সবাই সমপরিমাণে ভাগ করে নেবে।

এসব স্বপ্নের বিভঙ্গে আমাদের কারো কারো সায় ছিল, পুরোপুরি না হলেও ভাসা-ভাসা, কারো-কারো হয়তো আদৌ সায় ছিল না। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশে ইতস্তত যে-ধরনের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, তা অনেকেরই মনে বিবমিষার সঞ্চার করেছিল, আমাদের মধ্যে অনেকে ঘৃণায়-আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন। এই অস্থির অবস্থায় আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরই শুধু নয়, আমাদের নিজেদেরও বিভ্রম ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, রাজশক্তি দুরভিসন্ধি এঁটেছেন, নানা দানবীয় কাণ্ডকারখানা সংঘটনের অপবাদের বোঝা এই ছেলেমেয়েদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন। দেশে চণ্ডশাসন, যা অভিযোগ করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখবার সুযোগ একদিকে হ্রস্বপ্রাপ্ত, অন্যদিকে, ঐ ঘনঘটার মুহূর্তে, যে-কোনো নিন্দাবাদ সাধারণ লোকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। সংবাদপত্রে-বেতারে-বিধান পরিষদে-সংসদে-প্রকাশ্য সভায় দিনের পর দিন ধরে প্রচার চলেছে, মতিভ্রষ্ট ছেলেমেয়েরা, আমাদেরই আত্মজ, কত পিশাচমনা রক্তলোলুপ-মনুষ্যত্ববর্জিত তা অহোরাত্র শোনানো হয়েছে আমাদের, প্রতিনিয়ত আমাদের সতর্ক করা হয়েছে, যে-সন্তান পশুবৃত্তি বেছে নিয়েছে, সে ত্যজ্য, সন্তানের চেয়ে সমাজ বড়ো, অতএব আমরা যেন নিষ্করুণ হই।

আমরা পাষাণ হয়ে থেকেছি। বছরের পর বছর ধরে, বিনা বিচারে, কিংবা বিচারের ভণিতায়, আমাদের পুত্র-কন্যা-ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রীরা কারারুদ্ধ, কেউ কেউ দণ্ডপ্রাপ্ত, কেউ কেউ অন্ধকারে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কারাকক্ষের অন্তরালে, অথবা কারাপ্রাচীরের বাইরেই, কোনো কুয়াশাচ্ছন্ন ঘটনায় কারো-কারো কাঁচা-সতেজ প্রাণ রাজশক্তি-নিয়োজিত ঘাতকের গুলিতে নিঃস্পন্দন হয়েছে। বিগত পাঁচ-ছ'বছর ভয়ে হোক, অভিমানে হোক, অন্যমনস্কতাহেতু হোক, হৃদয়হীনতাহেতু হোক, ভুল-বুঝেছি বলে হোক, আমরা নীরবে থেকেছি, বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি, সামান্যতম অস্বস্তিবোধ পর্যন্ত আমাদের হয়নি। এখানে-ওখানে একটি-দুটি বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদধ্বনি শোনা গেছে, কিন্তু বহুর ঔদাসীন্যে তা অচিরে স্তিমিত হয়ে এসেছে।

আমাদেরই রক্তের উত্তরাধিকারী এরা। এদের ভুল-ভ্রান্তির দিকটাই কি শুধু দেখবো, ত্যাগের দিকটা নয়, আদর্শবোধের দিকটা নয়? আশঙ্কা হয়, আমাদের হিসেবে কোথাও চিড় ধরেছে। শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখুন, অজস্র রাস্তার নাম, পার্কের নাম, সেতুর নাম : বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, সূর্য সেন স্ট্রীট, অনিল রায় রোড, প্রীতিলতা ওয়দ্দেদার সরণি। এইসব নামের উল্লেখে এখনো আমাদের ধমনী চঞ্চল হয়, হঠাৎ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পিছনে চলে যাই আমার, স্বগত প্রণাম জানাই পূর্বসূরীদের, যাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন যাতে নিটোল-সুন্দর বাস্তব রূপ নিতে পারে তার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছিলেন, অনেকে প্রাণটুকু পর্যন্ত। লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন, দৈন্য-দারিদ্র্যে-কৃচ্ছ্রে তাঁদের দিন অতিক্রান্ত হয়েছে, তাঁরা আমাদের নমস্য। দৈনন্দিনতার আরক্ত কোলাহলে তাঁদের কথা প্রায়ই ভুলেই থাকি, কিন্তু অবিমিশ্র অকৃতজ্ঞ নই আমরা, ঐ যে মাঝে-মাঝে বাসের গায়ে লেখা 'কুঁদঘাট থেকে বি-বা-দী বাগ' তা-ই প্রমাণ করে।

পূর্বসূরীদের ত্যাগকে যদি শ্রদ্ধা জানাতে পারি, সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে অন্য সিদ্ধান্ত হবে কেন? কোন্ যুক্তিতে ত্যাগের দুই মাপকাঠি স্বীকার করে নেবো? বিনা বিচারে বিচারাধীন, দণ্ডপ্রাপ্ত যে হাজার-হাজার যুবক-যুবতী-কিশোর-কিশোরী পাঁচ-ছ-সাত বছর ধরে কারাকক্ষের অভিশপ্ত অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে, সমস্ত অর্থেই তারা বিনয় বসু-বাদল গুপ্ত-দীনেশ গুপ্তের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী, সূর্য সেন-প্রীতিলতা ওয়দ্দেদার-সন্তোষ মিত্রের

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

মতো তারাও স্বপ্ন দেখেছে, শুধ্ সময় যেহেতু কয়েক দশক এগিয়ে গেছে, তাদের স্বপ্নের প্রকৃতি একটু অন্যরকম, কিন্তু সে-স্বপ্ন বড়ো নিষ্কলুষ, স্বপ্নকে সত্য করার তাগিদে তাদের যে ত্যাগ, তাতেও কোনো খাদ নেই।

তবে কি আমরা বাঙালিরা অন্য ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছি? লেপে-মুছে দিচ্ছি আমাদের অতীতের ঐতিহ্য? একটু স্পষ্ট করে বলি। যারা কারার আড়ালে, তারা অনালোচিত থেকেছে, অথচ গত কয়েক বছর ধরে আরেক শ্রেণীর যুবক-তরুণদের নাম হঠাৎ খবরের কাগজে ছাপা হতে শুরু হয়েছে, বেতারে ঘোষিত হয়েছে, লোকের মুখে-মুখে বলাবলি হয়েছে। ভুঁইফোঁড়ের মতো তাদের মঞ্চাবির্ভাব, তাদের বৈভবের অভাব নেই, মসৃণ-নিঃশব্দ গাড়িতে তাদের নগর-পরিক্রমা, বিমান-যোগে দিল্লি পৌঁছে তারা সুনিবিড় সলাপরামর্শ করে, বিমানপথেই তাদের রাশভারি প্রত্যাবর্তন, তারা ব্যস্ত, ব্যবসায়ীরা তাদের ভেট দিচ্ছে, খবরের কাগজে তাদের মস্ত-মস্ত বিবৃতি ছাপা হচ্ছে, সর্দিকাশি হলে তারা অতিবিলাসী নার্সিংহোমে বিশ্রামের জন্য যাচ্ছে। তারা তরুণ, অথচ তাদের জীবনযাত্রায় কৃচ্ছ্রসাধনের লেশমাত্র নেই, কিন্তু কাগজে-বেতারে তাদেরই নাম মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হচ্ছে, সারা দেশ যেন তাদের নিয়েই ব্যাপৃত। ত্যাগের যতগুলি সংজ্ঞা, তাদের আচরণ-বিচরণ সব-ক'টির পরিপন্থী, তবু তাদের নামই মুখে-মুখে ফেরে; যারা কারারুদ্ধ, যারা হত, মৃত, আদর্শনিষ্ঠাহেতু যারা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে, তারা বিস্মৃত। আমাদেরই সন্তান-সন্ততি, অথচ ভুলে থেকেছি তাদের; এই গ্লানির শেষ নেই। দেশ ফের একটা ধাক্কা খেয়েছে, ফের অনেক কিছু উথাল-পাথাল। আমাদের, বিশেষ করে বাঙালিদের, এবার নতুন করে আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হবে। তারুণ্যকে নিশ্চয়ই বরণ করবো। তরুণদের হাতেই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ভুবনের ভার। কিন্তু যে-তারুণ্যকে সন্নত প্রণাম জানাবো, কী তার বংশপরিচয়? সে কি ঝকঝকে গাড়ি চড়বে, বিমানে বিমানে খ্যাতির পিছনে ধাওয়া করবে, অভিজাত হোটেলে খানা খাবে, ব্যবসাদার-চোরাকারবারীদের প্রাসাদে বাড়িঘর গুছোবে? না কি সে আমাদের পুরনো সংজ্ঞায় আবার স্থিত করবে, ত্যাগ-আদর্শনিষ্ঠার ঐতিহ্য চেতনার সঙ্গে ফের ওতপ্রোত জড়াবে? কাকে বাছবো, তিতিক্ষার আগুনে পুড়ে যে সোনা অমলিন তাকে, নাকি সস্তা-রাংতায় মোড়া ইতর এক প্রস্তরখণ্ডকে?

এখানেও হয়তো দ্বন্দ্বের নিরসন হবে না। আইনের বর্ম পরে বাঘা-বাঘা নীতিবিদ্রা বসে আছেন, তাঁরা হয়তো বলবেন, কোনো কোনো পাপের ক্ষমা নেই, আমাদের পুত্র-কন্যা-ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী যে বীভৎস অনাচারের জন্য দায়ী, ত্যাগেও তার স্খালন নেই। কিন্তু নীতিবিদ্রা বুকে হাত রেখে বলুন তো, ভারতী তরফদার-কিষাণ চট্টোপাধ্যায়-সিরাজুল ইসলাম প্রমুখের বিরুদ্ধে যে-অনাচারের অভিযোগ, তার চেয়ে হাজার গুণ গুরু অনাচার তাঁরা কি হালে অনুষ্ঠিত হতে দেখেন নি, যে অনাচারের হোতা জাতির সম্ভ্রান্ততম বংশের সন্তান?

কোন্ তুলাদণ্ড সঙ্গে নিয়ে আমরা বিচারকের ভূমিকায় অভিনয়ে নামবো?

এপ্রিল ১৯৭৭, আনন্দবাজার পত্রিকা

সুজিত দাস স্মরণে

আশির দশকে আলোড়ন তোলা পুস্তিকা 'মানুষের জন্য ওষুধ, না ওষুধের জন্য মানুষ' নামক যুক্তিগ্রাহ্য ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, ভেষজ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহুল-প্রচারিত এই পুস্তিকাটির রচয়িতা, ড্রাগ-অ্যাকশন ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনের প্রায় আজীবন সভাপতি ডাঃ সুজিত কুমার দাস, গণআন্দোলনের কর্মীদের অতি প্রিয় 'সুজিতদা', প্রয়াত হলেন গত ২০ এপ্রিল, ২০১১। তাঁর মৃত্যুতে চিকিৎসা, চিকিৎসক এবং জনমুখী চিকিৎসা বিষয়ক আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের অবসান ঘটলো বলা যায়।

ছাত্রজীবন থেকেই গণআন্দোলনের কর্মী সুজিত দাস আরজিকর মেডিক্যাল কলেজকে সরকারি হাসপাতালে রূপান্তরের আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য স্থপতি ছিলেন। ১৯৭২-৭৭-এর সন্ত্রাসের দিনে তিনি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন-বিরোধী স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার 'অপরাধে' কর্মচ্যুত হন। এ-রাজ্যে প্রথম ডাক্তারদের ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন, হেলথ-সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন গঠনে তিনি মুখ্য ভূমিকা নেন। তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগ ও সাংগঠনিক দক্ষতায় ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার পেশাদার কর্মীদের সমস্ত সংগঠনগুলি চিকিৎসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যৌথ দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনে নামেন।

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং সঠিক জাতীয় ভেষজ-নীতি প্রণয়নের জন্য তিনি আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। ড্রাগ-অ্যাকশন ফোরামের ডাকে বহুজাতিক সংস্থার অবৈজ্ঞানিক ওষুধ বয়কটের আন্দোলনের সপক্ষে সুজিত দাস তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী চালনা করেন এবং এই বয়কটের সূত্রেই বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের প্রস্তুত করা অবৈজ্ঞানিক বেশ কিছু ওষুধ একে একে ভারতের বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। সুজিত দাসের চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত যুক্তির কাছে পরাভূত হয়ে ভারত সরকারও নারীদের ব্যবহারযোগ্য এক জাতের জন্মনিরোধক পদ্ধতি সরকারি হাসপাতাল থেকে প্রত্যাহার করে নেয়।

ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর সেখানকার পীড়িত মানুষদের যথাযথ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দাবিতে সরব হয়ে তিনি 'মিক্' গ্যাসের প্রতিষেধক 'এনএটিএস' ইনজেকশন দেওয়ার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত ভূপালের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কমিটিতে তিনি ছিলেন একমাত্র বেসরকারি চিকিৎসক সদস্য। তিনি এবং আরও একজন বেসরকারি প্রতিনিধির দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের জন্য প্রস্তুত করা ভূপাল সংক্রান্ত 'মাইনরিটি রিপোর্ট' আজও ভূপাল গ্যাস কাণ্ডের প্রাথমিক আকর দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

সুজিত দাস আমৃত্যু গণআন্দোলনে সম্পৃক্ত থেকেছেন। বন্দীমুক্তি থেকে পোখরান, সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, 'নর্মদা বাঁচাও' থেকে সবুজ-বিপ্লব বিরোধী কার্যকলাপ— সবক্ষেত্রেই ছিলো তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থিতি। স্বাস্থ্য, চিকিৎসায় অনাচার, গণবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত বই-পুস্তিকার সংখ্যা প্রচুর। তিনি 'অনীক'-এ স্বাস্থ্য-বিষয়ক কয়েকটি ফিচারও লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুতে 'অনীক' শোকস্তব্ধ।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

নোয়াম চমস্কি

এটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে অপারেশনটি ছিল পরিকল্পিত হত্যার, তার সঙ্গে যোগ করুন আন্তর্জাতিক আইনের প্রাথমিক ধারাগুলিও ভঙ্গ করা। মনে হয় যে নিরস্ত্র শিকারকে ধরার কোনো চেষ্টা হয় নি, ৮০ জন কম্যান্ডো আর বিপক্ষে যেখানে, তাদের নিজেদের দাবি অনুযায়ীই, (ওসামার) স্ত্রী-র তেড়ে আসা ছাড়া আর কোনো বিরোধই ঘটে নি, সেখানে এটি করাই যেত। যে সব সমাজে আইনকে কিছুমাত্র সম্মান দেওয়া হয় সেখানে সন্দেহভাজনদের আটক করে আইনের সামনে আনা হয়। আমি এখানে 'সন্দেহভাজন' কথাটার ওপর জোর দিতে চাইছি। ২০০২ সালের এপ্রিলে এফবিআই-এর প্রধান রবার্ট মুয়েলার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন যে, ইতিহাসে বৃহত্তম অনুসন্ধানের পরও এফবিআই এর বেশি বলতে পারছে না যে ষড়যন্ত্রটি আফগানিস্তানে করা হয়েছিল কিন্তু সংযুক্ত আমিরশাহী ও জার্মানিতে তা কাজে লাগানো হয়েছিল বলেই এফবিআই-এর 'বিশ্বাস'। ২০০২ সালে এই ছিল তাদের বিশ্বাস, তার ৮ মাস আগে তালিবানরা যখন ওয়াশিংটনকে জানিয়েছিল যে প্রমাণ দিলে তারা বিন লাদেনকে তাদের দেশ থেকে বের করে দেবে (কতখানি সিরিয়াস ছিল এ প্রস্তাব তা আমরা জানি না, কারণ প্রস্তাবটি সাথেই সাথেই প্রত্যাখ্যান করা হয়), তখন ওয়াশিংটন নিশ্চয়ই সেটা জানত না, আর আমরা এর পরেই জেনেছি যে ওয়াশিংটনের হাতে সেরকম কোনো তথ্যপ্রমাণ ছিল না। তাহলে ওবামা যখন হোয়াইট হাউসে তাঁর বিবৃতিতে বললেন যে "আমরা শীঘ্রই জানতে পারি যে ৯/১১-র আক্রমণটি আল কায়দার করা", তখন তিনি স্রেফ মিথ্যা বললেন।

সেই সময় থেকে কোনো সিরিয়াস তথ্যপ্রমাণ দেওয়া হয়নি। বিন লাদেনের 'স্বীকারোক্তি'-র কথা খুব বলা হচ্ছে, কিন্তু সেটা যেন আমার এই স্বীকারোক্তির মতো যে আমি বোস্টন ম্যারাথন জিতেছি। তিনি এটাকে একটা বিরাট সাফল্য মনে করে সে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেছেন।

অ্যাবোটাবাদে বিন লাদেনের উপস্থিতি সম্পর্কে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও সুরক্ষা বাহিনীর একাংশ নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তান লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয় নি বলে ওয়াশিংটনের ক্রোধ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে অনেক আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে তাদের দেশের সীমানার মধ্যে ঢুকে একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালাল তাতে পাকিস্তানের ক্রোধ নিয়ে বিশেষ কিছু বলা হচ্ছে না। পাকিস্তানে মার্কিন বিরোধী সুর ইতিমধ্যেই যথেষ্ট তীব্র, এই ঘটনাবলী তাকে তীব্রতর করবে। দেহটি সমুদ্রে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম বিশ্বের অনেক জায়গায় ক্রোধ ও অবিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছে।

আমরা নিজেদের জিজ্ঞাসা করি, ইরাকি কম্যান্ডোরা যদি জর্জ বুশের বাড়িতে নেমে তাকে হত্যা করে দেহটা অতলান্তিকে ভাসিয়ে দিত, আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হত? তার অপরাধ যে বিন লাদেনের চেয়ে বেশি সেটা প্রশ্নাতীত। তিনি 'সন্দেহভাজন' নন, প্রশ্নাতীতভাবে তিনি 'সিদ্ধান্তগ্রহণকারী', "সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ" করার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি, "অন্যান্য যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে এর তফাত এই যে এটির মধ্যে সমস্ত অপরাধ পুঞ্জীভূত" (ন্যুরেমবার্গ ট্রাইবুনাল থেকে উদ্ধৃত), যার জন্য নাৎসি অপরাধীদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়েছিল: হাজার হাজার মৃত্যু, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু, দেশের বিরাট অংশ ধ্বংস, তিক্ত গোষ্ঠী-বিরোধ যা এখন অঞ্চলের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

বলার আছে বস্-কে (কিউবার এয়ারলাইন বম্বার, ওরলান্ডো বস্) নিয়েও, কয়েকদিন আগে যিনি ফ্লোরিডায় শান্তিপূর্ণভাবে মারা গেলেন, বা 'বুশ তত্ত্ব' নিয়েও, যাতে বলা হয়েছে যে, যে সব সমাজ সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেয় তারা সন্ত্রাসবাদীদের মতোই অপরাধী, আর সেভাবেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। কেউ এটা লক্ষ্য করলেন না যে এর মধ্য দিয়ে আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করার, এ দেশকে ধ্বংস করার ও এদেশের অপরাধী প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার ডাক দেওয়া হলো।

নাম নিয়েও একই ব্যাপার। অপারেশন জেরোনিমো। পুরো পশ্চিমা সভ্যতা জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব এতই গভীর যে, কেউ লক্ষ্য করলেন না যে এর মধ্য দিয়ে বিন লাদেনকে গণহত্যাকারী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলা যোদ্ধার সঙ্গে এক করে দেখানো হলো, তাকে সম্মানিত করা হলো। আমাদের হত্যার অস্ত্রগুলির নাম যেমন দেওয়া হয় আমাদের শিকারদের নামে: আপাশে, টোমাহক...। লুফৎওয়াফ যেন তাদের যুদ্ধ বিমানগুলির নাম দিয়েছে 'ইহুদি' বা 'জিপসি'।

আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্ট ও প্রাথমিক তথ্যগুলিও আমাদের ভাবানোর মতো।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

লাদেনের ‘জেহাদ’ ও সন্ত্রাস

পার্থ সারথি

লাদেনের রাজনীতি

সৌদি আরবের এক কোটিপতি সন্তান ওসামা বিন লাদেনের জেহাদ তথা ধর্ম-যুদ্ধ সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কারণ তার জেহাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল বর্তমান দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু শুরু থেকেই লাদেন মার্কিন বিরোধী ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলেজ পাশ করার পর প্রথমে লাদেন আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মুজাহিদিন তথা ‘মুক্তি-যোদ্ধা’-দের সংগ্রামে যোগ দেন। তখন আমেরিকার কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর মাধ্যমে আফিগানিস্তানে সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধ পরিচালনায় নিয়মিত অর্থ এবং অস্ত্রের যোগান দিত, সাথে প্রশিক্ষণও। সেই সময়ে আফিগানিস্তানের মাটিতে আল-কায়দার জন্ম। বিন লাদেন এবং আল-কায়দার বেড়ে ওঠার পেছনে যে আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদত ছিল, তা প্রায় সর্বজনবিদিত। আমেরিকার প্রায় সকল কুকর্মের সহযোগী ব্রিটেনের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী রবিন কুক লিখেছেন, ‘পশ্চিমী প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির পাহাড়-প্রমাণ বেহিসেবি কাজের ফলেই আল-কায়দা এবং ওসামা বিন লাদেনের জন্ম সম্ভব হয়েছে’। তিনি আরো বলেন, আল-কায়দা কথার অর্থ তথ্য-সম্ভার, সোভিয়েত রাশিয়াকে পরাস্ত করার জন্য যে হাজার হাজার যুবককে নেওয়া হত এবং সিআইএ-র সাহায্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে মুজাহিদিন তৈরি করা হত, কম্পিউটারে তাদের সম্পর্কে তথ্য রাখার জন্য আল-কায়দা নামে ফাইল খোলা হয়েছিল’।[১]

অর্থাৎ কর্ম-জীবনের শুরুতে আমেরিকার সহযোগিতা নিলেও লাদেনের মার্কিন বিরোধিতার সূত্রপাত তার নিজ দেশ সৌদি আরবে মার্কিন ফৌজ মোতায়েন করার সময় থেকে। ১৯৯০ সালে ইরাক কুয়েত দখল করে নেওয়ার পর সৌদি আরবের রাজা ফয়েদ সেদেশে ইরাকি আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য চান। ইতিমধ্যে ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ফৌজ আফগানিস্তান থেকে হটে যাবার পর লাদেন যুদ্ধ-জয়ী বীরের সম্মান নিয়ে দেশে ফিরেছেন। লাদেন রাজাকে বলেন, মুজাহিদিন-দের সাহায্য নিয়ে দেশ রক্ষা করবো। মার্কিন ফৌজকে ফিরিয়ে দাও। রাজা তাতে রাজি না হয়ে উল্টে লাদেনকেই দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। এরপর থেকেই লাদেন তীব্র মার্কিন বিরোধী হয়ে ওঠেন। তার মতে, পবিত্র মক্কা-মদিনা যে দেশে অবস্থিত সেখানে বিধর্মী বিদেশি শক্তির উপস্থিতি পৃথিবীর ১২৫ কোটি মুসলিম সহ্য করবেন না।

নিজ দেশে বিদেশি সৈন্যের উপস্থিতির বিরুদ্ধে এই জেহাদ-এর পেছনে স্বদেশ-প্রেমের উপাদান কতটা ছিল বলা মুস্কিল, কারণ লাদেনের জেহাদি রাজনীতি কোনো দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। লাদেনের ধারণায় গোটা পৃথিবীর মুসলমান ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষরা মিলে একটা জাতি একটা সমাজ, তিনি তাদের প্রতিনিধি, তাদের যোদ্ধা। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে মুসলিম জনগণ আক্রান্ত হলে তাদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা তার। তার কাছে লড়াইটা ছিল ১২৫ কোটি মুসলিমের সাথে আমেরিকা ও তার সহযোগীদের। সিএনএন-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লাদেন বলছেন, শুধু আরব ভূখণ্ড থেকে হাত গুটিয়ে নিলেই আমেরিকা-বিরোধী জেহাদ শেষ হবে না। আমেরিকাকে সমস্ত মুসলিম দুনিয়া থেকে হাত উঠিয়ে নিতে হবে।[২]

আফগানিস্তানে মুজাহিদিন-দের জয় লাদেনের আত্ম-বিশ্বাসকে এতটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, তার মনে হতো আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যেতে পারলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো আমেরিকাও একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এটা নিছকই একটা সমাপতন ছিল যে, আফগানিস্তান যুদ্ধের ঠিক পরপরই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছিল, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল এই দোর্দণ্ড-প্রতাপ বৃহৎ শক্তিটি। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বিপর্যয়ের পেছনে মূল কারণ ছিল সেই দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কট, যা ঠিক ওই সময়েই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ অবশ্যই তার সঙ্কট বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু লাদেনের অভিমত, ১০ বছর ধরে মুজাহিদিনের কাছে মার খেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বস্বান্ত হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে গেলে এই যুদ্ধ দানবটিকেও ধ্বংস করা যাবে।[৩]

একটা আগ্রাসী শক্তি হিসাবে আমেরিকার পতন সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের কাম্য হলেও এই উদ্দেশ্য সাধন করতে লাদেন ও আল-কায়দা অনুসৃত জেহাদের পদ্ধতি শেষ বিচারে আমেরিকার হাতকেই শক্তিশালী করলো বলে মনে হয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের শেষে দুনিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ চালিয়ে যেতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় বৈধতা যোগালো আল-কায়দার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ।

লাদেনের মতাদর্শ

তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন আল-কায়দার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে লাদেন বলেছিলেন, “আল-কায়দা তৈরি হয়েছে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাবার জন্য, বিশেষ করে সেইসব বিধর্মী দেশের বিরুদ্ধে যারা ইসলামিক দেশের ওপরে হামলা চালাচ্ছে।... ইসলাম

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

বিরোধী প্রতিটি মানুষ জেহাদ সম্পর্কে ভীত। আল-কায়দা চায় জেহাদকে জীবন্ত ও সক্রিয় রাখতে এবং মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গে পরিণত করতে।''[৪] আমেরিকার বিরুদ্ধে তার জেহাদ প্রধানত ও মূলত ইসলামিক কিছু দেশের (ইরাক ও আফগানিস্তানে) ওপরে আমেরিকার হামলা চালানো এবং অন্যত্র মুসলিম জনগণের ওপরে (মূলত পালেস্তাইন জনগণের ওপরে ইজরায়েলের) হামলায় মদত যোগানোর কারণে। যা প্রমাণ করে যে আমেরিকা 'একটি ইসলাম-বিরোধী শক্তি এবং অন্যান্য ইসলাম-বিরোধী শক্তির মদতদাতা'।

লাদেনের বিশ্বাস ছিল একমাত্র ইসলামিক 'শরিয়াতি' আইন বলবৎ করার মধ্য দিয়েই মুসলিম জনগণের জীবন সঠিক খাতে বইতে পারে। তার মতে একমাত্র প্রকৃত ইসলামি দেশ ছিল তালিবানি নেতৃত্বের অধীন আফগানিস্থান। ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে সমস্ত ইসলামিক দেশ ও মুসলিম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল তার মূল আদর্শ। আর এই লক্ষ্য অর্জনে তার হাতিয়ার ছিল জেহাদ। তার কথায়, ''জেহাদের আহ্বানে মুসলিম দেশগুলোর জনগণের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছে।... জেহাদের মাধ্যমে একজন যা চায় সব পেতে পারে। একজন মুসলিমের কাছে সবচেয়ে বড়ো পাওয়া হচ্ছে মৃত্যুর পরে জীবন। আর শহিদ হওয়ার মাধ্যমেই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সেই অবিনশ্বর জীবনে পৌঁছে যাওয়া যায়।''

এই আদর্শ ও লক্ষ্য চরিতার্থ করতে ১৯৯৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি লাদেন এবং বিভিন্ন ইসলামিক দেশের মুসলিম নেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক বিশ্ব ইসলামিক ফ্রন্ট গঠন করেন এবং সেই ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ইহুদি এবং খ্রিস্টান ধর্ম-যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। সেই ঘোষণাপত্রে[৫] বলা হয়, ''গত ৭ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরব ভূখণ্ডে ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র স্থানগুলোকে দখল করে রেখেছে, সেখানকার সম্পদ লুঠ করছে, শাসকদের পরিচালিত করছে, জনগণকে অপমানিত করছে আর ওখানে ঘাঁটি গেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশের মুসলিম জনগণের ওপরে হামলা চালাচ্ছে। ...এই খ্রিস্টান-ইহুদি (Crusader-Zionist) আঁতাতের ফলে ইরাকি জনগণের ওপরে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছে, সেখানে ১০ লক্ষের ওপর মানুষ নিহত হয়েছেন। আমেরিকার লক্ষ্য তার নিজস্ব ধর্মীয় ও আর্থিক স্বার্থ করার পাশাপাশি ইহুদিদের ক্ষুদে রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করা এবং জেরুজালেমের ওপরে ইজরাইলের দখলদারি ও মুসলিমদের হত্যাকাণ্ড থেকে নজর ঘোরানো। ...আমেরিকানদের এইসব অপরাধ এবং পাপকর্ম আল্লাহ্, তাঁর বার্তাবাহক এবং মুসলিমদের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া কিছু নয়।... এই অবস্থায় আল্লার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সকল মুসমিলদের উদ্দেশ্যে এই ফতোয়া জারি করছি যে, প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য হলো যখন যেখানে সম্ভব আমেরিকান ও তার মিত্র দেশগুলোর সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করা।...''

লক্ষ্য করার বিষয় হল, আমেরিকার এই মুসলিম-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য লাদেন মূলত খ্রিস্টান আমেরিকাকে দায়ী করছেন না। তার বক্তব্য, আমেরিকান ইহুদিরা আসলে আমেরিকার নীতি নির্ধারণ করছেন এবং তারাই আমেরিকার মুসলিম-বিরোধী অবস্থানের জন্য দায়ী। তার কথায়, ''আমরা আমেরিকার সরকারি ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে, যেটা পুরোপুরি আমেরিকান-ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে চলছে। এই ইহুদিদের আসল স্বার্থ ইজরাইল, আমেরিকা নয়। এটা স্পষ্ট যে, আমেরিকার জনগণ আসলে ইহুদিদের গোলামে পরিণত হয়েছেন।''[৬]

এতগুলো উদ্ধৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্য লাদেন এবং জেহাদিদের মতাদর্শ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া। স্পষ্টতই লাদেনের গোটা কর্মকাণ্ডের পেছনে ছিল ধর্মের অনুপ্রেরণা, 'আল্লার নির্দেশ'। জেহাদের প্রাথমিক লক্ষ্য যদি হয় আগ্রাসী পশ্চিমী শক্তিকে মুসলিম দুনিয়া থেকে উৎখাত করা, তাহলে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ইসলাম ধর্মের প্রসার ও পুনরুজ্জীবন ঘটানো। ইসলামিক রীতি-নীতি আইনকে কঠোরভাবে বলবৎ করতে 'পশ্চিমী সংস্কৃতি'র প্রভাবকে নির্মূল করা। সেজন্যই লাদেন জেহাদকে মুসলিমদের জীবনের অঙ্গে পরিণত করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ বাইরের শক্তি পরাস্ত হওয়ার পরেও লড়াই চলবে ইসলামিক দেশগুলোর ভেতরে মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলাম-ভিত্তিক মৌলবাদী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে, যেমনটা কিনা তালিবান শাসকরা আফগানিস্তানে করেছিল।

একটা সময় ধর্মকে কেন্দ্র করে নিপীড়িত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এবং অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলন করেছেন ঠিকই, কিন্তু আজকের সময়ে মতাদর্শ হিসাবে ধর্মীয় মৌলবাদ প্রগতির বিপরীতে কাজ করে। কারণ প্রথমত, আজ সর্বত্র শ্রমজীবী মানুষ বহু ধর্মে বহু মতে বিভক্ত, তাই ধর্মীয় মৌলবাদ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। বিপরীতে শাসিত বঞ্চিত মানুষকে একই ধর্মের অনুগামী শোষক-শাসককে বন্ধু হিসেবে ভাবতে শেখায় (লক্ষণীয়, সৌদি আরবের রাজা আমেরিকার এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করলেও তার বিরুদ্ধে লাদেন জেহাদ ঘোষণা করতে অস্বীকার করেন[৭], কারণ ধর্ম-যুদ্ধ তো একমাত্র বিধর্মীদের সাথেই হতে পারে!) দ্বিতীয়ত, এই ভাবধারা মুক্ত চিন্তার বিরোধী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির পরিপন্থী।

এটা ঠিকই যে, ধর্মীয় মৌলবাদী হওয়া সত্ত্বেও লাদেন এবং তালিবানরা প্রথমে সোভিয়েত আগ্রাসন ও পরে আমেরিকার সামরিক হামলার বিরোধিতা করেছেন এবং তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন। এদের লড়াই আপাত-দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল সংগ্রাম হিসেবে মনে হতে পারে। আমাদের দেশের কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ তৈরি করে পশ্চিমী পুঁজির ঢালাও অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করেছিল। দেখা দরকার আদতে এদের কার্যক্রম সাম্রাজ্যবাদকে আদৌ কতোটা

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

দুর্বল করে...!!

সন্ত্রাসের কর্মনীতি

সন্ত্রাসবাদ বা সন্ত্রাসমূলক কর্মসূচি কোনটাকে বলবো আর কোনটাকে বলবো না, তা নিয়ে নানান মত উঠে আসে। বিশেষত, আজকের দিনে যখন বিশ্ব জনগণের প্রধান শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পশ্চিমী মিত্ররা 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' চালাবার নাম করে দেশে দেশে হস্তক্ষেপ করছে, আগ্রাসন চালাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে, তখন সেই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়ছে এমন কোনো শক্তিকে সন্ত্রাসবাদী বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। ভারতবর্ষ সহ দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই নয়া আগ্রাসনের সহযোগী শাসককুলও সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে দেশের জনগণের ওপরে দমন-পীড়নের নতুন অজুহাত খুঁজে পাচ্ছে। এদেশে বিভিন্ন বিদ্রোহী শক্তি যারা ভারত রাষ্ট্রের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নিয়ে লড়াই শুরু করেছে, তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে জনগণের একটা বড়ো অংশের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় ভাবালুতা এড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা একটু কঠিন হয়ে পড়ে বৈকি!

অনেকে মনে করেন, আল-কায়দা সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, তাই এটা সন্ত্রাসবাদ, এটা নিন্দনীয়। যদি ওরা বুশকে মারতে পারতো তাহলে সেটা আনন্দের কাজ হতো। আমরা দু'হাত তুলে লাদেনের জয়গান করতাম বা এ রাজ্যে মাওবাদীরা সিপিএম-এর অনুগামী গরিব মানুষদের মারছে, তাই আমরা এর বিরোধী। যদি ওরা সিপিএম-এর দু-চারটে চাঁই মারতে পারতো, তাহলে খোলাখুলি না হলেও মনে মনে তাকে সমর্থন করতাম। আসলে মূল সমস্যা অন্য জায়গায়। লেনিন সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করেছিলেন কারণ, সন্ত্রাস গণ-আন্দোলন গণ-উদ্যোগকে প্রতিস্থাপিত করে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মকাণ্ডের স্থান নেয় অল্প কিছু বীরের মহিমময় সাহসিকতা আর আত্মদান। সন্ত্রাসবাদের দর্শন অনুযায়ী, জনগণ নন, বীরেরা ইতিহাস তৈরি করে। এই দর্শন পেটি-বুর্জোয়া দর্শন, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের দর্শন, যারা মনে করেন, জনগণ নির্বোধ। জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হলে তাই 'উত্তেজক' ঘটনা ঘটাতে হয়। যে ঘটনা ঘটাবে অল্প কিছু সাহসী বীর যোদ্ধা। সকল সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তাই ব্যক্তির বীরত্বকে মহিমান্বিত করে, জনগণের উদ্যোগ যে শত গুণ বেশি বীরত্বপূর্ণ হতে পারে, সে বোধ তাদের থাকে না।

সন্ত্রাসবাদীদের আরেকটি ধারণা হচ্ছে, তাদের সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড শক্তিশালী রাষ্ট্রকে সন্ত্রস্ত করবে, বিপর্যস্ত করবে। এই ধারণা থেকেই লেনিনের সময় নারদনিকরা সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি অবলম্বন করে রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের প্রতিভূ জারকে পর্যন্ত হত্যা করেছিল। তথাপি লেনিন নারদনিকদের এই ধারণার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কার্যত জারকে হত্যা করার পর নারদনিকদের অতি গোপন অতি বিপ্লবী সংগঠন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে না পেরে শেষ হয়ে যায়। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে দেখা গেছে, এরকম সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রাষ্ট্রকে দুর্বল করার বদলে আরো শক্তিশালী করে। রাষ্ট্র এইসব সন্ত্রাসমূলক কাজকে সামনে রেখে দমন-পীড়ন চালাবার যৌক্তিকতা তৈরি করে। তার বাহিনীকে আরো বেশি সশস্ত্র করে, আরো বেশি প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করে। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটায়। রাষ্ট্রের সামরিকীকরণকে আরো উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যায়। আর এই সুযোগে নানাবিধ কালা আইন তৈরি করে জনগণের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে সেসব কাজে লাগায়।

লাদেন এবং আল-কায়দার কর্মকাণ্ড বিচার করলে আমরা দেখবো, তাদের সন্ত্রাসবাদী কাজ ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে বিরাটভাবে শক্তি যুগিয়েছে। প্রথমত, সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর কমিউনিজম-এর যে জুজুটিকে সামনে রেখে আমেরিকা পশ্চিমী দেশগুলোর ওপরে আধিপত্য চালিয়ে আসছিল, তার একটা পরিবর্ত দরকার ছিল। আল-কায়দার বিভিন্ন হামলা, বিশেষ করে আমেরিকার বুকে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের দুটি গগনচুম্বী অট্টালিকায় বিমান হানা চালিয়ে সে দুটিকে ধ্বংস করে ফেলার ঘটনা, আমেরিকাকে সেই পরিবর্ত জুজুর যোগান দিল। সারা দুনিয়া জুড়ে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণা করতে তার হাতে অস্ত্র তুলে দিল।

দ্বিতীয়ত, যারা মনে করেছিলেন, এই ঘটনায় আমেরিকার দর্প চূর্ণ করা গেলো, পরবর্তী ঘটনা ঘটনা-প্রবাহ তাদের ভ্রান্ত প্রমাণ করলো। আমেরিকা বিশ্ব জনগণের মতামতের তোয়াক্কা না করে একের পর এক দেশে হস্তক্ষেপ করা শুরু করলো। ইউরোপ ও তৃতীয় দুনিয়ার কিছু দেশ আমেরিকার আগ্রাসী অভিযানের (বিশেষত ইরাকে) বিরোধিতা করলেও সে বিরোধিতার জোর এমন ছিল না যা এই যুদ্ধ দানবের গতিরোধ করতে পারে। গত এক দশক ধরে প্রায় একচেটিয়া ক্ষমতা প্রদর্শন করে সদর্পে গোটা দুনিয়া দাপিয়ে বেড়ালো আমেরিকা।

তৃতীয়ত, এই পর্বে বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী কার্যকলাপের বিরোধিতার রাস্তায় নামলেও আক্রান্ত দেশগুলিতে আমেরিকার দর্প চূর্ণ করার মতো গণপ্রতিরোধ ও গণপ্রতিবাদ দানা বাধলো না। আমেরিকা ইরাক ও আফগানিস্তানে যেভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করলো এবং বিশেষত ইরাকে যেভাবে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ও মারণ যজ্ঞ চালালো, তার বিরুদ্ধে না ঐসব দেশগুলোতে বেশ কিছু পাল্টা হামলা সংঘটিত হলেও তাতে জনগণের ভূমিকা খুব উজ্জ্বল হয়ে ফুটে বেরোলো না। অর্থাৎ ইরাক বা আফগানিস্তানের মানুষ আমেরিকার আগ্রাসন চাইছেন না, মার্কিন ফৌজের দ্রুত অপসারণই তাদের কাম্য, জনকণ্ঠের এই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল না। ফলে, মৌলবাদী সন্ত্রাসে যতজন মানুষ মারা

এর পর ২৯ পৃষ্ঠায়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

কে বড় সন্ত্রাসবাদী?

মিতা দত্ত

গত ৩রা মে। খবরের কাগজে বড় খবর, ওসামা বিন লাদেন মার্কিন সেনার হাতে নিহত। স্বাভাবিকভাবেই, পশ্চিমবঙ্গে ভোট-যুদ্ধ চলা সত্ত্বেও খবরের কাগজের সিংহভাগ দখল করে নিয়েছে এই আলোচনা। কী ভাবে মারা হলো তাকে, পাকিস্তানের অবস্থান কী, আমেরিকাবাসীদের উল্লাস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার বাণী, ইত্যাদি। তবে এ বিষয়ে কারোর সন্দেহ নেই ওসামা ছিলেন সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী। তার মৃত্যুতে সন্ত্রাসবাদের অবসান না হলেও সে পথে অনেকটা এগোনো গেল, তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

ওসামা বিন লাদেন যে সন্ত্রাসবাদী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিষয়টার একটু গভীরে যাওয়া যাক। কেন আমরা ওসামাকে সন্ত্রাসবাদী বলছি? তার কারণ সন্ত্রাস সৃষ্টি করা ছিল ওসামার রণকৌশল। আর এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে নিরীহ মানুষের প্রাণ বলি দিতে কোনো আপত্তি থাকে না এই সন্ত্রাসবাদীদের। পুরনো ঘরানার সন্ত্রাসবাদীদের থেকে এরা তাই আলাদা। আমাদের দেশের ক্ষুদিরাম থেকে বিনয়-বাদল-দীনেশ বা রাশিয়ার নারদনিক, তারা রাষ্ট্রকে সন্ত্রস্ত করতে চাইলেও তার জন্য কোনো নিরীহ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটানোর পন্থা নেন নি, তারা প্রাণ নিয়েছেন ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের। আজকের সন্ত্রাসবাদীদের একটা বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রকে বা বিদেশি কোনো শক্তিকে সন্ত্রস্ত করার জন্য তারা যে পথ নেন, কখনো কখনো সামরিক বাহিনী বা পুলিশের বিরুদ্ধে চালিত হলেও প্রায়ই তা নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটায়। আর এই প্রাণহানির ঘটনাগুলি ভুল বা দুর্ঘটনা নয়, এমনকি সাধারণ অর্থে প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে হয়ে যাওয়া 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ'ও নয়, এগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঘটানো। উদ্দেশ্য, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। রাষ্ট্রের মনে, জনসাধারণের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা।

স্বাভাবিকভাবেই এই ভাবে সাধারণ মানুষকে মেরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার পন্থা সারা বিশ্বের মানুষ খুব ভালভাবে নেন নি। লাদেন বা আল কায়দা তাই সারা বিশ্বে নিন্দিত, ধিক্কৃত। এতটাই নিন্দিত যে তাকে মারার জন্য অন্য দেশে বোমাবর্ষণ করা যায়, অন্য দেশে আক্রমণ নামানো যায়। তাকে ধরার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য একটি দেশের মধ্যে ঢুকে পড়ে সেখানে অপারেশন চালাতে পারে।

ওসামা বিন লাদেন সন্ত্রাসবাদী সন্দেহ নেই। কিন্তু কত বড় সন্ত্রাসবাদী সে? কত মানুষকে হত্যা করেছে তার সংগঠন? কতজন নিরীহ অসামরিক মানুষের প্রাণ গেছে আল কায়দার হাতে? খবরের কাগজের হিসাব অনুযায়ী সংখ্যাটা চার হাজারের কিছু বেশি- ৪২৯৯ জন। এর মধ্যে ২৯৯৪ জন আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ঘটনায় নিহত। বাকিরা ১৯৯৮ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আল কায়দার সন্ত্রাসবাদী হানায় নিহত অসামরিক মানুষ। ৪২৯৯ জন অসামরিক মানুষ হত্যা।

এবার আমি আরেকটি সংখ্যার প্রসঙ্গে আসব। ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হানার ঘটনার পরবর্তী দশ বছরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সারা বিশ্বে কত জন অসামরিক মানুষের প্রাণ নিয়েছে? সংখ্যাটি ১২ লক্ষ। বলে রাখা ভালো, এই সংখ্যাগুলি নেওয়া হয়েছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৩ মে ২০১১ থেকে। সূত্র হিসাবে তারা দিয়েছেন সিআরএস রিপোর্ট আরএল ৩৩১১০ ডিফেন্স ম্যানপাওয়ার ডাটা সেন্টার : মিডিয়া রিপোর্ট।

১২ লক্ষ অসামরিক মানুষ। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, ছাত্র-শিক্ষক। এদের একমাত্র অপরাধ তারা কোনো বিশেষ দেশের নাগরিক, যে দেশটি আমেরিকার বিষদৃষ্টিতে পড়েছে। এর মধ্যে আহতদের ধরা হয় নি। ধরা হয় নি আল কায়দা সন্দেহে অন্যায়ভাবে বন্দীদেরও।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আল কায়দার সন্ত্রাস আর যুদ্ধে প্রাণহানি, এ দুটোকে এক করে দেখাটা ঠিক হবে না। কারণ, আল কায়দা ধরনের সন্ত্রাসবাদীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য নিরীহ মানুষদের হত্যা করে, আর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মানুষ মারা যায়- সেটা 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ'। সাধারণ মানুষকে মারাটা উদ্দেশ্য নয়, তাদের রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু যুদ্ধে সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই দাম দিতে হয়।

সত্যি কি তাই? যুদ্ধে শুধু সামরিক লক্ষ্যগুলি ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালানো হয়? ঠিকই, ১৮৯৯ সালের হেগ কনভেনশনে তাই বলা হয়েছিল। মানুষ-মারা অস্ত্র ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বর্বরতা-র ওপর বিধিনিষেধ চাপানো হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানের যুদ্ধে (এবং ঘোষিত যুদ্ধ ছাড়াও অন্য ধরনের আক্রমণে) যে ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং যে ভাবে ব্যবহার করা হয় তাতে এধরনের কোনো বিধিনিষেধ মানা হয় না। ২০০৩ সালের ইরাকে বোমাবর্ষণের সাফাই গাইতে পেন্টাগনের এক কর্তা যেমন বলেছিলেন, "সাদা পতাকা দেখা না গেলে... অসামরিক হত্যা কম রাখার প্রচেষ্টা বাদ দিতে হবে,"

এরকম একটা মানুষ মারা অস্ত্র হলো ক্লাস্টার বম্বিং, যাতে বোমার মধ্যে বোমা থাকে, আর সেই বোমা ফেটে একটা এলাকার সব মানুষ মারা যান বা মারাত্মক জখম হন। যুদ্ধে আজকাল লক্ষ লক্ষ ক্লাস্টার বোমা ফেলা হয়। মার্কিন কর্তারা অবশ্য বলে থাকেন যে এগুলি শুধুমাত্র সামরিক লক্ষ্যবস্তুর

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ওপর ফেলা হয়, তবে তাঁরা স্বীকার করেন যে, 'দুর্ঘটনা' ঘটে থাকে, কখনো কখনো মিসাইলগুলি 'লক্ষ্যভ্রষ্ট' হয়, 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' ঘটে। কতটা ড্যামেজ? ২০০৬ সালে *হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল* জানিয়েছে, ক্লাস্টার বোমা থেকে নিহতদের ৯৮ শতাংশই অসামরিক ব্যক্তি। কোল্যাটারাল ড্যামেজ, নাকি সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যা?

কীভাবে ঘটে এই হত্যাকাণ্ড? একটি ক্লাস্টার বোমা ফাটলে, তার ৫০ মিটারের মধ্যে মানুষ মারা যাবে, আহত হবে এক কিলোমিটার পর্যন্ত দূরের মানুষ। এক একটি দেশে এরকম বোমা ফেলা হয়েছে লক্ষ-লক্ষ। আজকাল যেমন শোনা যায় যে প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে বহু দূর থেকে নিখুঁত লক্ষ্য ভেদ করা যায়, এক ফুট এদিক-ওদিক হয় না, ক্লাস্টার বোমা সেরকম বোমা নয়, তাই সামরিক লক্ষ্যবস্তুর তুলনায় গ্রাম-শহরের অসামরিক জনতাকে মারার জন্যই এটি সুপ্রযুক্ত।

এছাড়া আছে না-ফাটা বোমা। বোমা ফেলার সাথে সাথে সব বোমা ফাটে না, গড় হিসাবে না-ফাটা বোমার সংখ্যা ১৬ শতাংশ। পরবর্তী কালে যেকোনো সময় সেগুলি ফাটতে পারে। বিশেষ করে শিশুরা খেলতে গিয়ে বোমায় হাত দিয়ে বোমা ফাটিয়ে ফেলছে, এরকম ঘটনা প্রচুর। কেবল ইরাকেই এরকম আট হাজার না-ফাটা বোমা-র তথ্যপ্রমাণ হাজির করেছে উইকিলিকস। ইজরায়েলও কম যায় না। ২০০৬ সালের যুদ্ধের শেষ সপ্তাহে তারা দক্ষিণ লেবাননে ৪০ লক্ষ ক্লাস্টার বোমা ফেলেছিল। তার মধ্যে ১০ লক্ষ না-ফাটা অবস্থায় থেকে গেছে।

আসলে এই ধরনের বোমা ফেলার পেছনে একটা তত্ত্ব আছে— দ্রুত আধিপত্যের তত্ত্ব, যার ডাক নাম 'শক অ্যান্ড অ', ধাক্কা দাও, ভীতি উৎপাদন করো। এই তত্ত্বের জনক অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন জেনারেল হর্নার ও সামরিক বিশ্লেষক হারলান উলমান বলছেন, ''তবে আমাদের উদ্দেশ্য হলো এমন ধরনের সামর্থ্য তৈরি করা যাতে বিপক্ষকে অক্ষম করে দেওয়ার মতো যথেষ্ট ধাক্কা ও ভীতি উৎপাদন করা যায়।' সাদা বাংলায়, যাতে বিপক্ষের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যায়।

যুদ্ধে ক্ষতিসাধন করার সময় সামরিক লক্ষ্যবস্তু আক্রমণ করায় কোনো দোষ নেই। কিন্তু এখন সামরিক লক্ষ্যবস্তু বলতে শুধু সামরিক লক্ষ্যবস্তু বোঝায় না। সামরিক কর্তা যদি কোনো লক্ষ্যবস্তুকে'সামরিক প্রয়োজন' মনে করেন, মনে করেন যে যুদ্ধে জেতার জন্য সেই লক্ষ্যবস্তুর ক্ষতিসাধন করা যায় তবে যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম মেনেই সেই লক্ষ্যে আক্রমণ করা যায়। কিছু কিছু জিনিস থাকে সেগুলি একই সঙ্গে সামরিক ও অসামরিক প্রয়োজন মেটায়। যেমন বিদ্যুতের লাইন, বাঁধ, যাতায়াতের রাস্তা, এয়ারপোর্ট। যুদ্ধের হিসাবে এগুলিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা যেতেই পারে, এবং তাই করা হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এগুলিতে যারা কাজ করেন তারাও যুদ্ধবাজদের চোখে আর 'অসামরিক ব্যক্তি' থাকেন না।

নানা নামে, নানা ভাবে অসামরিক ব্যক্তি হত্যা। উদ্দেশ্য এক। মানুষের মনে, রাষ্ট্রের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি। দুপক্ষের হাতই রক্তাক্ত। একপক্ষের হাতে নিহত ৪২৯৯। অন্য পক্ষের হাতে নিহত ১২,০০,০০০। কে বড় সন্ত্রাসবাদী?

(এই লেখাটি লিখতে বিশেষ সাহায্য নেওয়া হয়েছে *মান্থলি রিভিউ* পত্রিকার এপ্রিল ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত বিউ গ্রসকাপ লিখিত 'ক্লাস্টার মিউনিশনস অ্যান্ড স্টেট টেররিজম' প্রবন্ধের)

লাদেন ও সাম্রাজ্যবাদ

দীপংকর চক্রবর্তী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সত্যিই আজ সারা দুনিয়ার একচ্ছত্র প্রভু, লাদেন হত্যার মধ্যে দিয়ে মার্কিন শাসকশ্রেণীর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ওবামা তা আবার নতুন করে প্রমাণ করে দিলেন (একই সঙ্গে তিনি অবশ্য আগামী বছরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষিতে তার ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তার পারদকে উঁচুতে তুলে নেবার লক্ষ্যটাও পূরণ করে নিয়েছেন!)। প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেন : তারা, মার্কিন শাসকশ্রেণীর স্বার্থে, 'যা বলেন, তা-ই করেন।' তবে সেই লক্ষ্যে লাদেনকে হত্যা করে তিনি তার সেই পূর্বপুরুষ, মার্কিন দাসব্যাবসায়ীরা যাকে হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে সুদূর আফ্রিকা থেকে অস্ত্রের জোরে আমেরিকায় ধরে নিয়ে এসেছিল, তার 'ঋণ'-ও শোধ করলেন কিনা সেটা আমাদের জানা নেই!

ওবামারা আশা করেছিলেন, দুনিয়ায় গণতন্ত্রকে রক্ষার মহান স্বার্থে 'সন্ত্রাস'-এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে, বিশেষত ৯/১১-র পর থেকে তারা (গত দুই শতাব্দীতে দেশে দেশে অন্তত ৫০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর উৎস) যে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন (যে যুদ্ধে গত এক শতকে কম করে পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে), ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করার মধ্যে দিয়ে তাতে তাদের বিতর্কাতীত বিজয় অর্জন সারা পৃথিবীর সশ্রদ্ধ সমর্থন অর্জন করবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। ওয়াশিংটনে কিছু মার্কিন নাগরিক অবশ্য উল্লাস প্রকাশ করতে জড়ো হয়েছেন, সাথে সাথে দুনিয়ার বিভিন্ন কোণে মনমোহন সিং-এর মতো মার্কিন তাঁবেদাররা সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু যে ঔদ্ধত্য ও দম্ভের সাথে মার্কিন বাহিনীর তকমা লাগানো খুনীর দল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরই সৃষ্ট লাদেন নামক ফ্র্যাংকেনস্টাইনটিকে হত্যা করতে গিয়ে সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি এবং অন্য দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি ন্যূনতম সম্মান, বিচারের ভিত্তিতেই কেবল কোনো অভিযুক্তকে শাস্তি দেবার সভ্যসমাজে অনুসৃত নীতি পদদলিত ও ধর্ষণ করেছে, দুনিয়ার ব্যাপক মানুষ তার

এর পর ৩১ পৃষ্ঠায়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

প্রবন্ধ

জিন পরিবর্তন — খাদ্য নিরাপত্তা বনাম মুনাফা

শুভ্রকেতন বসু

জিন-পরিবর্তিত শস্য নিয়ে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো আলোচনার আগে জিন কী সে বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। জিন-পরিবর্তিত শস্য চাষে লাভ বা ক্ষতি যাই হোক তার সুফল বা কুফল সমাজের বিস্তৃত অংশের উপর পড়বে। তাই সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ এই বিষয়ে আগ্রহী হবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু জীববিজ্ঞানের যে জটিল ও ধারাবাহিক গবেষণার ফলশ্রুতিতে আজকে জিন-পরিবর্তিত শস্য তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে এবং পরিবেশ বিজ্ঞানের যে সূত্রগুলি বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকলে, জিন পরিবর্তিত শস্য চাষের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত দেবার সময় যুক্তি থেকে আবেগের ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠতে পারে।

জিন কী? প্রশ্নটি জটিল। এই প্রশ্নের বিশুদ্ধ জীববিজ্ঞান-সম্মত উত্তরে না গিয়েও এটুকু বলা যায়, যে কোনো জীবের প্রায় যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক হল জিন। একটা প্রাণী কেন বাঁদর আর একটা প্রাণী কেনই বা তিমি মাছ, তা নির্ভর করে তার কোষে কোন্ ধরনের জিন রয়েছে তার উপর। বাঁদরের শরীরের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের নীল নক্‌শা রয়েছে তার জিনে। সেটাকে একটু বদলে দিয়ে বাঁদরের শরীরে তিমি মাছের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসা এখন আর খুব অসম্ভব কিছু নয়। গত কয়েক দশক ধরে এধরনের অদ্ভুত জীব বেশ কিছু বানানো হয়েছে। যেমন, মাকড়সার জিন ছাগলের কোষে ঢুকিয়ে এমন ছাগল বানানো গেছে যার দুধে মাকড়সার জাল তৈরির প্রোটিন পাওয়া যাবে। মাকড়সার জাল যেহেতু পৃথিবীর সব ধরনের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তুর মধ্যে সবচেয়ে শক্ত, তাই ওই প্রোটিন দিয়ে রেশমের মত ফুরফুরে অথচ ইস্পাতের থেকেও কঠিন কাপড় বানাবার চেষ্টা চলছে।[১] এই যে এক প্রজাতির জীব থেকে জিন তুলে নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের প্রজাতির দেহে ঢুকিয়ে দেবার ক্ষমতা— এটা মানুষের একটা অনন্য অর্জন। বিগত ৩০০ কোটি বছরের বিবর্তনের ইতিহাসে এ ঘটনা ঘটে নি বললেই চলে।

জীব জগতের স্বাভাবিক নিয়ম হলো, এক প্রজাতির সাথে অন্য প্রজাতির জীবের জিন বিনিময় ঘটে না। যেমন, আম গাছের পরাগ জাম গাছের ফুলে পড়লে কোনো বীজ সৃষ্টি হবে না। কৃত্রিম উপায়ে কুকুর আর বেড়ালের শুক্রাণু আর ডিম্বানুর মিলন ঘটালেও কোনো জীব জন্মাবে না। যদি বা কখনও দুটি পৃথক প্রজাতির জীবের মধ্যে সংকরায়ণের ফলে কোনো নতুন জীব জন্মায়ও, তাহলে সেটি বন্ধ্যা হয়। যেমন, ঘোড়া ও গাধার মিলনে উৎপন্ন হওয়া অশ্বেতর বন্ধ্যা হয়। জীব জগতের ব্যাকরণ মানলে তাই হাঁসজারু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বলাই বাহুল্য, জিন প্রযুক্তি এই ব্যাকরণ মানে না, তাই জোনাকি পোকার জিন তামাক গাছে, ব্যাঙের জিন আলুতে, মানুষের জিন ব্যাকটেরিয়ায়, আকচার ঢোকানো হচ্ছে। এই প্রযুক্তি অত্যন্ত জটিল এবং ব্যয়বহুল। সাধারণত কোনো জীবের জিন থাকে তার কোষের কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে। নিউক্লিয়াসের হাজার হাজার জিনের ভিড়ে কোনো একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক জিনকে খুঁজে বার করা, তাকে বিচ্ছিন্ন করা ও আবার অন্য কোনো জীবের নিউক্লিয়াসে প্রতিস্থাপন করা অতি দুঃসাধ্য কাজ। এবং এই কাজে অকল্পনীয় পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। তাই জিনপ্রযুক্তি-জাত কোনো পণ্যকে তাড়াতাড়ি বাজারজাত করে মুনাফা করার একটা প্রবণতা সব সময়ই থাকে।

পৃথিবীতে কোনো জীব একলা বাঁচতে পারে না। তাকে বাঁচতে হয় অন্যান্য জীব ও প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে। বিভিন্ন জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক অতি জটিল ও সূক্ষ্ম। এই সম্পর্কের ভারসাম্য সামান্য বিঘ্নিত হলেও পরিবেশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এমনকি কিছু প্রজাতি বিলুপ্তির পথেও চলে যেতে পারে। প্রতিটি প্রজাতির জীব লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তার আশেপাশের সমস্ত জীবের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, এই সম্পর্কের ভারসাম্যের ভিত্তিতেই তার পরিবেশ বা ইকোসিস্টেম সুস্থায়ী হয়। প্রত্যেকটি জীবেরই রয়েছে তার নিজস্ব জিন। যে জিনগুলির সাহায্যে সে তার প্রতিবেশী জীবগুলির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। কোনো জীবের জিনে আচমকা কোনো বিবর্তন আনলে শুধু জীবটির দেহেই পরিবর্তন আসে না, সেই জীবটির সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জীবের মিথস্ক্রীয়াতেও বিরাট পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের ফলে সমগ্র পরিবেশের ভারসাম্য কোন দিকে হেলে পড়বে তার খানিকটা আন্দাজ পেতে গেলেও সংরক্ষিত স্থানে দীর্ঘদিন ধরে এই জিন-পরিবর্তিত জীবগুলির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে। কিন্তু পুঁজি মুনাফার জন্য অতদিন অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। তাই তারা জিন-পরিবর্তিত শস্যকে তাড়াতাড়ি বাজারজাত করতে চায়। মুনাফা করার উদগ্র বাসনায় এমন অনেক জিন-পরিবর্তিত ফসল চাষ করার পরামর্শ দেওয়া হয় সেগুলির প্রয়োজনীয়তা আদৌ তর্কাতীত নয় অথচ পরিবেশের উপর তাদের প্রভাব অজ্ঞাত, অনিশ্চিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। এই জাতীয় কিছু জিন-পরিবর্তিত ফসল যেগুলি ভারতের বাজারে ঢোকানোর চেষ্টা চলছে সে সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা হল।

গোল্ডেন রাইস— জিন প্রযুক্তিজাত এই ধরনের চালে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যাবে। তাই ভারতের ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত অপুষ্টি দূর করতে এ নাকি একেবারে মোক্ষম দাওয়াই। এই ধানের মালিক মনস্যান্টো কোম্পানি ভারতীয়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

শিশুদের রাতকানা রোগ দূর করার মহান ব্রত নিয়ে এই ধান ভারতের বাজারে ঢোকানোর জন্য একেবারে উঠে-পড়ে লেগেছে। কোনো কোনো পণ্ডিতম্মন্য সর্বাধিক বিক্রিত কাগজে, স্কুলের মিড-ডে মিলে গোল্ডেন রাইস খাওয়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন। পুঁই শাক, কচু শাক, কুমড়ো ইত্যাদি অত্যন্ত সস্তার সব্জিতে যখন প্রচুর ভিটামিন 'এ' আছে তখন গোল্ডেন রাইস কেন, এই প্রশ্ন তোলা যায়। এখানে বরং একটা অন্য তথ্য পেশ করা যাক। গোল্ডেন রাইসের চালে যে পরিমাণ ভিটামিন 'এ' আছে তা দিয়ে কোনো মানুষের দৈনিক ভিটামিন 'এ'-র চাহিদা মেটাতে হলে তাকে রোজ ৯ কেজি ভাত খাওয়াতে হবে।[২] গোল্ডেন রাইস দিয়ে ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত অপুষ্টি তাড়ানোর দাবি তাই শুধু উদ্ভট্টই নয় এর পেছনে মুনাফার মাংসল কামনা বড় বেশি চোখে পড়ে।

একইরকম নষ্টামি চোখে পড়ে লৌহ সমৃদ্ধ ধানের ক্ষেত্রে। ভারতে লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতা তাড়াতে এই ধান নাকি একেবারে অপরিহার্য্য। স্বাধীনতার ৬০ বছর পরেও যে দেশের সরকার দরিদ্র মানুষের ঘরে ১০ পয়সা দামের আয়রন ট্যাবলেট পৌঁছে দিয়ে লোহার অভাবজনিত অপুষ্টির মোকাবিলা করতে পারে না, যে সরকার লোহার অভাবজনিত অপুষ্টির অন্যতম কারণ আমাশা রোগের প্রাদুর্ভাব কমানোর জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারে না, তারা এখন ছুটছে জিন প্রযুক্তির পিছনে। লৌহ সমৃদ্ধ ধানের পরীক্ষামূলক চাষের বিরুদ্ধে চুঁচুড়ার ধান গবেষণার কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে ড. দেবল দেব যথার্থই একে বিজ্ঞজনের বেশ্যাবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছিলেন। চালের মাধ্যমেই যদি লোহা খেতে হয় তাহলেও জিন প্রযুক্তিজাত চালের দরকার নেই। দেশীয় জাত ভূতমুড়ি থেকেই যথেষ্ট লোহা ও ভিটামিন 'বি' পাওয়া যায়।[৩] আদিবাসী মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই এই ভাতের ফ্যান গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের খাইয়ে আসছেন।

বি টি শস্য

জিন প্রযুক্তি জাত আর একটি শস্য হল Bt-শস্য। বিভিন্ন ধরনের Bt-শস্য তৈরি করা হয়েছে, যেমন Bt-তুলো, Bt-বেগুন, Bt-ধান ইত্যাদি। ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস নামক এক ব্যাকটেরিয়ার একটি জিন এই ধরনের শস্যে প্রতিস্থাপিত করা হয়। ফলে এই শস্যের প্রতিটি কোষে একধরনের বিষ উৎপন্ন হয়। কোনো পোকা এই শস্যের কোনো অংশ খেলে ঐ বিষের প্রভাবে মারা পড়বে। তাই দাবি করা হয় Bt-শস্য সর্বপতঙ্গ প্রতিরোধী। কিন্তু যে বিষের উপস্থিতির কারণে Bt-শস্য সর্বপতঙ্গ প্রতিরোধী সেই বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে পতঙ্গের খুব বেশি প্রজন্ম সময় লাগে নি। ফলে ঐসব শস্যে পতঙ্গের আক্রমণ বেড়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের চাষিরা মনস্যান্টো কোম্পানির আশ্বাস পেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে বোলগার্ড তুলোর (Bt-তুলো) বীজ কিনে চাষ করেছিলেন। কোম্পানির পক্ষ থেকে চাষিদের বলা হয়েছিল যে, এই তুলো চাষে কীটনাশকের খরচ হবে শূন্য। কিন্তু বাস্তবে বোলগার্ড তুলোর ক্ষেতে পোকার মারাত্মক আক্রমণ ঘটে। প্রচুর কীটনাশক প্রয়োগ করেও যা দমানো যায়নি। ফসল উজাড় হয়ে যাওয়ায় অনেক চাষি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের কৃষিমন্ত্রীরা জনসমক্ষে বিবৃতি দিয়ে মনস্যান্টো কোম্পানির বোলগার্ড তুলোর সার্বিক ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছিলেন।[৪]

শুধু ভারতের এই সমস্ত রাজ্যেই নয়, Bt-শস্যের ব্যর্থতা বিশ্বব্যাপী। জিন পরিবর্তিত শস্য চাষ করে কীটনাশকের ব্যবহার তো কমেই নি উল্টে বেড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ ভ্যারাইটির পরিবর্তে জিন-পরিবর্তিত শস্য চাষের কারণে শুধু ২০০১-২০০২ সালেই ৭৩ মিলিয়ন পাউণ্ড অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করতে হয়েছিল।[৫] Bt-শস্যের অন্য ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। যেমন, এই শস্যের বিষাক্ত পরাগ খেয়ে মৌমাছি, প্রজাপতি ইত্যাদির মৃত্যু ঘটতে পারে।[৬] Bt-শস্যের মূল থেকে বেড়িয়ে আসা বিষাক্ত নির্যাসে মাটির উপকারি ব্যাকটেরিয়া সমূহ মারা পড়তে পারে, ফলে মাটির উর্বরতা ভীষণ কমে যাবে।[৭] সবচেয়ে বড় কথা Bt-শস্যের প্রতিটি কোষে উপস্থিত পতঙ্গনাশক বিষ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর কী প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। জিন-পরিবর্তিত শস্য মানুষের স্বাস্থ্যের উপর কী বিরূপ প্রভাব ফেলে সে সংক্রান্ত গবেষণাপত্র বহুজাতিক সংস্থাগুলি চেপে দেবার চেষ্টা করে। এবং সংশ্লিষ্ট গবেষকদের নানাভাবে হেনস্থা করে। যেমন, ড. আপার্ড পুশকাই *The Lancet* পত্রিকায় ১৬ই অক্টোবর ১৯৯৯ সংখ্যায় ইঁদুরের উপর জিন-পরিবর্তিত আলুর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে তার গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণা পত্রটি ফিরিয়ে নেবার জন্য কর্পোরেট দুনিয়া তার উপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করে। তবে পৃথিবীর সৌভাগ্য, ব্রুনোর এই উত্তরসাধক বিজ্ঞানের পতাকা বহন করার স্পর্ধা রাখেন।[৮] প্রবল চাপের মুখেও গবেষণাপত্রটি তিনি ফিরিয়ে নেন নি।

জিন-পরিবর্তিত শস্যের ক্ষতিকর দিক সংক্রান্ত এত ভুরিভুরি তথ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বহুজাতিক কোম্পানিগুলি নিছক মুনাফার স্বার্থে জিন-পরিবর্তিত ফসল আমাদের দেশে চালাতে চাইছে।

টার্মিনেটর প্রযুক্তি

এমন জিন-পরিবর্তিত ফসল তৈরি করা হচ্ছে যার থেকে উৎপন্ন বীজ বন্ধ্যা হবে। ফলে এই জাতীয় বীজ কোম্পানির থেকে একবার কিনে ব্যবহার করলে পরের বছর আর সেই ফসল থেকে বীজ তৈরি করা যাবে না। ফলে প্রতিবছর চাষিকে নতুন করে বীজ কিনতে হবে। এই প্রযুক্তির নাম টার্মিনেটর প্রযুক্তি। এতে কোম্পানির যে লাভই হোক, চাষির কোনো লাভ নেই।

রাউণ্ড আপ রেডি ফসল

মনস্যান্টো কোম্পানি রাউন্ড আপ নামে একধরনের উদ্ভিদনাশক বিষ বাজারে বিক্রি করে। কোম্পানির পক্ষ থেকে এটিকে আগাছানাশক বলে চালানো হয়। কোনো জমির আগাছা মারতে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

গেলে এই বিষ খুবই সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হয় কারণ এই বিষ একই তীব্রতায় ফসলও ধ্বংস করতে পারে। মনস্যান্টো কোম্পানি জিন-প্রযুক্তির সাহায্যে এমন ফসল তৈরি করেছে যা ঐ রাউণ্ড আপ বিষ (যার মূল উপাদান গ্রাইফোসেট) সহ্য করতে পারবে। এই জাতীয় ফসল চাষ করলে সেখানে রাউন্ড আপ ব্যবহারে যথেচ্ছ আগাছা মরে যাবে কিন্তু ফসল মরবে না। এই ধরনের ফসলকে বলে রাউণ্ড আপ রেডি ফসল। এতে কোম্পানির দ্বিগুণ লাভ, একদিকে রাউণ্ড আপ রেডি ফসলের বীজ বিক্রি হবে, অন্যদিকে রাউন্ড আপ বিষ। কিন্তু এই জাতীয় ফসল চাষ করলে সেই ফসলের পরাগ অন্যান্য নিকট প্রজাতির উদ্ভিদের ফুলের উপর পড়ে সংকরায়ণের মাধ্যমে গ্রাইকোসেট সহনশীল আগাছারা জন্ম দেবে। এই ধরনের আগাছাকে বলা হয় Super weed বা মহা-আগাছা, যাদের দমন করা প্রায় অসম্ভব।[৯]

দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব

আগের আলোচনা থেকে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, জিন প্রযুক্তিজাত বেশ কিছু ফসল আমাদের দেশে ঢোকানোর চেষ্টা চলছে, যা কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করলেও পরিবেশ তথা সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করবে। বর্তমানে যে 'জাতীয় কৃষক নীতি' গ্রহণ করা হয়েছে তাতে জিনপ্রযুক্তি-জাত শস্য চাষ করার নিবিড় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০০ সালেই আমেরিকার সাথে ভারতের কৃষি প্রযুক্তি চুক্তি হয়েছে যার নাম India US Knowledge Initiative on Agriculture : Work Plan 2000। এই চুক্তিতে বলা হয়েছে ভারতের কৃষি বিজ্ঞান চর্চায় আমেরিকার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হবে। কৃষি বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি হবে বাজারের চাহিদা মাফিক। বিনিয়োগকারীদের চাহিদা মাফিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি তৈরি হবে। অর্থাৎ দেশের পুরো শিক্ষা ও গবেষণা পরিকাঠামোকে কিছু কোম্পানির মুনাফার স্বার্থে ব্যবহার করা হবে। দেশের পরিবেশ খাদ্য নিরাপত্তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ক্ষতিকর GM বা জিন প্রযুক্তি চালানো হবে।

কৃষি এখন পুঁজির নতুন মৃগয়া ক্ষেত্র। কিন্তু কৃষি উৎপাদনে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ পুঁজির বর্তমান প্রবণতা নয়। বরং কৃষির বিভিন্ন উপকরণ ও কৃষি পণ্যের বাণিজ্যেই তার প্রধান ঝোঁক। স্বভাবতই পুঁজির স্বার্থে এমন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে যাতে কৃষির উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা যায়।

ভারত জৈব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ দেশগুলির অন্যতম। এদেশে প্রায় ৯০০০ অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতি পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩৯০০টি খাদ্য উৎপাদনে, ৫২৫টি তন্তু উৎপাদনে, ৪০০টি পশু খাদ্য হিসাবে, ৩০০টি কীটনাশক উৎপাদনে, ৩০০টি আঠা ও রং প্রস্তুত করতে, ১০০টি সুগন্ধী হিসাবে এবং বাকি প্রজাতিগুলি বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুত করতে বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এই প্রতিটি উদ্ভিদ প্রজাতির অসংখ্য ভ্যারাইটি ছিল।[১০] যেমন, কেবল ধানেরই ৫০,০০০-এর বেশি ভ্যারাইটির অস্তিত্ব ছিল। এই সমস্ত ভ্যারাইটির মধ্যে এমন অত্যাশ্চর্য গুণ ছিল যা সর্বাধুনিক জিনপ্রযুক্তি-জাত শস্যকে লজ্জা দিতে পারে। বাংলায় এমন ধান আছে যার একটা ধানে দুটো চাল হয়।[১১] ভারতে এমন ধান আছে যা একবার কাটলে আবার গজায় এবং প্রথমবার কাটার মাস খানেকের মধ্যে দ্বিতীয়বার ফলন পাওয়া যায়।[১২] এই সমস্ত গুণ কোনো জিনপ্রযুক্তি-জাত ধানে নেই। সুগন্ধ, খরা সহনশীলতা, বন্যা সহনশীলতা, লবণাক্ততা সহনশীলতা ইত্যাদি গুণ দেশি ধানে যেভাবে আছে কোনো জিনপ্রযুক্তি-জাত ধান তার ধারে কাছে পৌঁছাবে না। এই সমস্ত জিন বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও কাজে লাগানোর কোনো কার্যকর পরিকল্পনা সরকারের তরফে নেই।

ভারতে প্রথম সবুজ বিপ্লব ঢুকেছিল উৎপাদন বাড়ানোর ধুয়ো তুলে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তথাকথিত উচ্চ ফলনশীল বিদেশি জাতের চাষ শুরু হয়েছিল। যে চাষে সার লাগলো অনেক বেশি আর প্রচুর কীটনাশক দিয়েও যে চাষের পোকা রোগ নিয়ন্ত্রণ করা গেল না। অথচ সেই সময় বিখ্যাত ধান্য বিজ্ঞানী ড. বিচারিয়া এমন ভ্যারাইটির সন্ধান পেয়েছিলেন যা বিনা সারে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তথাকথিত উচ্চফলনশীল বিদেশি জাতের থেকে বেশি ফলন দিত।[১৩] ঐ উচ্চফলনশীল দেশীয় জাতগুলি সংরক্ষণের কোনো পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা দেশের কৃষি মন্ত্রক করে নি।

খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হলে, পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে, এবং বিশ্বায়িত পুঁজির আগ্রাসন থেকে কৃষি ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হলে কৃষক আন্দোলনের একটি অন্যতম প্রধান অ্যাজেন্ডা হওয়া উচিত দেশীয় শস্য বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ।

নির্দেশিকা :

১. Sebastian R.A., Peter K.V; Spiders of India : University Press
২. Dr. Deb Debal : Industrial Vs Ecologycal Agriculture : Navdhanya; New Delhi, 2004
৩. Dr. Deb Debal : Seeds of Tradition Seeds of Future, Folk Rice Varieties of Eastern India, RSFTE, New Delhi, 2004
৪. তথ্যসূত্র ২
৫. ঐ
৬. ঐ
৭. ঐ
৮. পাল অনুপম; কৃষি ভাবনা ও দুর্ভাবনা
৯. ঐ পৃ. ৩
১০. Aroro RK (Co-ordinator IPGRE office of South Asia c/o NBPGR) Ethno Botany, Vol 9
১১. ঐ পৃ. ৩
১২. লেখকের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ
১৩. Prof. Brehmachary R.L. Some Interesting Properties of Folk Rice Varieties : Proceeding of the workshop on condervation and community copy rights of Folk Crop Variery; WWF - India, Eastern Region, 1996.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

প্রবন্ধ

জিন-পরিবর্তিত খাদ্য : কেন আমরা শঙ্কিত?

সমরেশ মিত্র

বিটি-বেগুন কাণ্ডের পর ভারতের প্রতিটি কোণে জিন-পরিবর্তিত খাদ্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভারতের পরিবেশ মন্ত্রীও বলছেন, এই সমস্ত জিন-পরিবর্তিত খাবার নিয়ে ভাবার কারণ আছে। জৈব-প্রযুক্তি হাতেকলমে প্রয়োগ করেন এমন অনেক বিজ্ঞানীই বলছেন যে এই প্রযুক্তি বিপজ্জনক— ফলে ধীরে চলাটাই যুক্তিযুক্ত।

বিতর্ক চলতে চলতেই ভারতের বাজারে এখন বেশ কয়েকটি জিন-পরিবর্তিত খাদ্য এসে গেছে। ভুট্টা, বেগুন, যব, সামান্য হলেও আলু এবং টমেটো। আমাদের তাই জানা দরকার, এই জিন-পরিবর্তিত খাদ্যগুলো ঠিক কী জাতের।

মানুষের স্বাভাবিক খাদ্যে অন্য শস্য বা প্রাণীর জিন ঢুকিয়ে দিয়ে যে 'নতুন' খাদ্যগুলি পাওয়া যায়, যা কিনা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, সেই খাদ্যগুলিকে আমরা জিন-পরিবর্তিত খাদ্য বলি।

যেমন বিটি-বেগুনের কথাই ধরা যাক। মনস্যান্টো নামের বহুজাতিক কোম্পানির গবেষণাকর্মীরা প্রকৃতিতে লভ্য বেগুনের মধ্যে মাটিতে পাওয়া যায় এরকম একটি জীবাণুর (ব্যাকটেরিয়া- ব্যাসিলাস থুবিনজিয়েনসিস, সংক্ষেপে বিটি) বিশেষ একটি জিন প্রবিষ্ট করেছেন। এর ফলে প্রকৃতিতে লভ্য বেগুনের যে স্বাভাবিক জিনসমূহ দিয়ে বেগুনের যে জিন ভাণ্ডার গঠিত, যা প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে বহু বছর ধরে একটু একটু করে একটি সুস্থিত রূপ পরিগ্রহ করেছে, বেগুনের সেই জিন ভাণ্ডারে এখন একটি বা কয়েকটি নতুন জিন যুক্ত হলো যা, কখনোই বেগুনের জিনভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মাটির জীবাণুর জিন সহ এই যে বেগুন মনস্যান্টো তার পরীক্ষাগারে সৃষ্টি করলো, সেই বেগুনের জিন প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে লভ্য বেগুনের জিনসমষ্টি থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন, জৈব প্রযুক্তি দ্বারা পরিবর্তিত। এই জাতীয় খাদ্যকে আমরা জিন-পরিবর্তিত খাদ্য বলে বর্ণনা করবো।

জিন-পরিবর্তিত খাদ্য 'তৈরি' করার পেছনে একটি মূলত ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে। জিনের গঠন এবং তার কার্যপ্রণালী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে এক সময়ে মনে করা হতো যে প্রতিটি জিন প্রাণী দেহে মূলত একটি বা একই জাতীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে। তাই একটি প্রাণীর বা শস্যের জিন অন্য একটি প্রাণী বা শস্যে চালান করলে সেই চালান করা জিন প্রাণী বা শস্যে কেবল মাত্র একটি কাজই সম্পন্ন করবে বলে ধরে নেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় জানা গেছে যে একটি জিন যে কোনও প্রাণীর দেহে শুধু যে একাধিক কাজ করে এমনই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে সেই জিনটির সমগ্র জিন-সমষ্টির কোথায় অবস্থান করছে তার ওপর নির্ভর করে সেই জিনটি প্রাণী বা শস্যর অন্য জিনকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। কখনো সেই সব জিনের কাজকর্ম সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে শস্য বা প্রাণীকে বিপন্ন করার পাশাপাশি ঐ খাদ্যের ভোক্তাকেও বিপন্ন করে তুলতে পারে। জিন পরিবর্তিত শস্যও তাই এমন বিপদ থেকে মুক্ত নয়।

কৃষি-কাজ কি জৈব-প্রযুক্তি?

আজ থেকে প্রায় হাজার দশেক আগে মানবজাতি কৃষিকাজের বিষয়টি উদ্ভাবন করে— জৈব প্রযুক্তিগত গবেষণার শুরু প্রায় সেই দিন থেকেই। প্রকৃতিতে লভ্য একই জাতের নানান শস্যর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ বুনো গাছকে কৃষি-যোগ্য গাছে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। আজকের যে সরেস ধানগাছ আমরা চাষ করি, তার বীজ এসেছিল জলা জমিতে জন্মানো কালো কালো শীষ-ওয়ালা লম্বা ঝোপের মতো এক জাতের গাছ থেকে। এমন নানা ধরনের শীষ থেকে বীজ নিয়ে তাদের মিলনে আদি কৃষকরা কৃষি-কাজের উপযুক্ত চমৎকার সব গাছ বানিয়েছিলেন, আধুনিক পরিভাষায় যাদের বলা হয়ে 'কাল্টিভার ভ্যারাইটি'।

পরাগ-মিলন নিয়ন্ত্রণ করে কৃষকরা যে সমস্ত নতুন নতুন বীজ বানাতেন, সেই বীজের মধ্যে যে সমস্ত জিন থাকত তা আসত প্রকৃতিতে লভ্য সেই প্রজাতির সমগ্র জিনভাণ্ডারের মধ্য থেকেই। কৃষকদের বানানো বিভিন্ন ধরনের বীজে জিনের সংখ্যার ও গুণের তারতম্য থাকত যার ফলে গাছের ও শস্যের গুণাগুণে তারতম্য ঘটত, কিন্তু ঐ বিভিন্ন শস্যের জিনে এমন কোনো প্রজাতির জিন থাকত না যা বিজাতীয়, অর্থাৎ কিনা ঐ প্রজাতির জন্য প্রকৃতি যা নির্দিষ্ট করে দেয়নি।

কৃষকরা এই সমস্ত পরিবর্তিত বীজগুলিকে শুধু যে যুগ যুগ ঘরে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাই নয়— ক্রমাগত তার পরিবর্তন ঘটিয়ে আরও নতুন নতুন শস্য তৈরি করেছেন। এই জাতীয় নতুন শস্য যেহেতু প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রজাতির মধ্যে বর্তমান জিন-সংক্রান্ত অবরোধ অতিক্রম করেনি, তাই তারা সহজেই প্রকৃতি-পরিবেশের খাপ খেয়ে গেছে। বস্তুত, সভ্যতার সেই প্রাক্কালে মানুষ যে সব উদ্ভিদকে কৃষিকাজ-উপযুক্ত করে গিয়েছিলেন, আধুনিক মানুষ তার উপর আর একটিও নতুন কৃষি-উপযুক্ত উদ্ভিত বানাতে পারেনি গত ৫০০ বছরে। বরং বলা যায়, তথা-কথিত শিল্প বিপ্লবের চাপে পড়ে আধুনিক মানুষ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের উদ্ভাবিত অনেক শস্য ধ্বংস করে ফেলেছে।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

কৃষকদের দ্বারা এমন অনন্য জৈব-প্রযুক্তির গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একই প্রজাতির বিভিন্ন গুণাবলী যুক্ত প্রাণীর মধ্যে যৌন মিলন ঘটিয়ে পশুপালকরা বিভিন্ন জাতের ভেড়া, ছাগল, গরু বানিয়েছিলেন যেগুলি তাদের আদি পিতৃপুরুষ থেকে বেশ কয়েকটি দিক দিয়ে আলাদা। কিন্তু তাদের জিন ভাণ্ডারের অন্য প্রজাতির প্রাণীর কোনও জিন নেই, তাই তারা তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মতই হরেক প্রজাতির ভীড়ে মিশে গেছে।

জিন প্রযুক্তি-জাত 'হাঁসজারু'

যাঁরা তামাক খান তাঁদের জন্য রয়েছে এক চিত্তাকর্ষক খবর। জোনাকি পোকা থেকে যে আলো বের হয় তার উৎস হলো একটি রাসায়নিক যৌগ, আর জোনাকি পোকার দেহে সেটি উৎপাদনের মূল হোতা হলো একটি জিন। কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থা, যাদের ব্যবসা হলো জৈব প্রযুক্তি জাত দ্রব্য কেনা-বেচা করা, তারা জোনাকি পোকার দেহের ঐ জিনটি তামাকের জিন-ভাণ্ডারে ঢুকিয়ে দিয়েছে; এর ফলে রাতের বেলা তামাকের খেতগুলি জোনাকি পোকার মতো আলো ছড়াবে। প্রকৃতি বিভিন্ন জিন মিশিয়ে যে তামাক গাছ ও তার নিজস্ব জিন-ভাণ্ডার গঠন করেছে কয়েক লক্ষ বছর ধরে, সেই জিন-ভাণ্ডারে জোনাকি পোকার জিনের কোনও স্থান ছিল না এবং নেই। জিন সংক্রান্ত এই আজব কাণ্ড-কারখানার প্রধান হোতা জৈব প্রযুক্তির বহুজাতিক সংস্থাগুলো। প্রকৃতির কাছে এর কোনও মান্যতা নেই। কোম্পানিগুলো যখন এমন 'হাঁসজারু' নির্মাণ করছে তখন তার পেছনের যুক্তি— কোনও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নয়, এমনকি তামাক উৎপাদন বাড়ানোও নয় যুক্তিটা স্রেফ অর্থনৈতিক, আরও স্পষ্ট করে বললে, কোম্পানির পক্ষ থেকে অনৈতিক মুনাফার তাড়না। এই জাতীয় জোনাকি-তামাক তৈরির পেছনে তাদের যুক্তি এই রকম— বড় বড় তামাক গাছে যদি পোকার আক্রমণ হয় তবে আক্রান্ত তামাকগাছগুলি মরে যাবে এবং তারা আর জোনাকির আলো ছাড়বে না। তাই তামাকের ক্ষেতে যেখানে যেখানে অন্ধকার সেখানেই পোকার আক্রমণ ঘটেছে, ফলে আক্রান্ত অংশগুলি সহজেই চিহ্নিত করে সেটি প্রতিহত করা যাবে। এর ফলে পোকাজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমে আসায় ব্যবসায় লাভ বাড়বে। কিন্তু জোনাকি পোকার বিজাতীয় জিন তামাক গাছকে আলো বিকিরণ-সক্ষম করলেও তা তামাক গাছের রোগ-প্রতিরোধকারী জিনগুলোর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। জিন-পরিবর্তিত এমন তামাকগাছের পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার স্বাভাবিক ক্ষমতাসম্পন্ন জিনগুলি তেমন ভালোভাবে আর কাজ করতে পারে না— এই বিজাতীয় জিন সম্পন্ন জিন প্রযুক্তিজাত তামাক সাধারণভাবে অতিরিক্ত রোগপ্রবণ হয়ে পড়ে। এই কথাগুলো কিন্তু কোম্পানিরা মোটেই বলে না। হাঁ, ঠিকই ধরেছেন, রোগপ্রবণ, দুর্বল এই সমস্ত জোনাকি-তামাক-কে পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য এই সমস্ত কোম্পানিগুলিই আবার বিশেষ কীটনাশক উদ্ভাবন করেছে। তাহলে ঘটনাটা দাঁড়ালো এই রকম— প্রথমে জিন-প্রযুক্তি জাত তামাক তৈরি করা হলো : তারা বাজার থেকে প্রাকৃতিক তামাককে প্রায় হঠিয়ে দেওয়ার আয়োজন করলো, এই নতুন জাতের তামাক পোকার আক্রমণে মরতে লাগল। সেগুলিকে পোকার থেকে বাঁচানোর জন্য এলো সেই একই কোম্পানির বানানো নতুন কীটনাশক, যা সাধারণ তামাকের জন্য অকেজো— মুনাফা হলো দু দফা। আসলে এই জিন-পরিবর্তিত ফসলের সঙ্গে বিজ্ঞানের চেয়ে বাণিজ্যের সম্পর্কই বেশি। আর কে না জানে, বাণিজ্য সব সময়েই চায় সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশি মুনাফা— তার জন্য বৈজ্ঞানিক কারচুপি করতেও মুনাফা-লোভীরা প্রস্তুত।

তামাকের মতো জিন পরিবর্তিত পণ্য চাইলে আমরা ব্যবহার নাও করতে পারি (অবশ্য তামাকচাষিরা সমস্যায় পড়েন), কিন্তু চাল-গম-আলু-মাছ ইত্যাদি যা আমাদের মূল খাদ্য, তা আমরা 'খাব না' বলে এড়িয়ে যেতে পারি না। তাই আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার যে জিন পরিবর্তিত খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে মূল বিপদগুলি কোথায় লুকিয়ে আছে।

জিন-পরিবর্তিত খাদ্য-র ক্ষেত্রে বিপদের দিক মূলত তিনটি। প্রথমটি হলো খাদ্য হিসেবে এই 'বিজাতীয়' খাদ্যগুলো নিরাপদ ও পুষ্টিকর কিনা, দ্বিতীয়টি হলো মানুষের খাদ্য হিসেবে এরা গ্রহণযোগ্য হলেও তারা প্রকৃতি-পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক কিনা এবং তৃতীয়টি হলো এই যে যদি জানা যায় কোনো একটি বা কয়েকটি এমন জিন-পরিবর্তিত খাদ্য সত্যিই মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য হিসেবে বিপজ্জনক, তবে আমরা সেই বিপজ্জনক খাদ্যকে চিহ্নিত করে ভোক্তাদের সে বিষয়ে সতর্ক করতে পারি কিনা! এমন বেশ কিছু খাদ্য গত দশ বছরে বাজারে এসেছে এবং এক বড় অংশের ভোক্তারা নিয়মিত এই সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করেছেন। এখন গবেষণায় দেখা গেছে এই সমস্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে অনেকেই নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং চিকিৎসকরা সেই সমস্ত রোগকে এই সমস্ত খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত করেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক জিন-পরিবর্তিত খাদ্যের জন্য রোগের প্রকোপের খবরও আসছে। তাই এই সমস্ত খাদ্য, খাদ্য হিসেবে কতটা নিরাপদ তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই সমস্ত খাদ্য বা শস্য-র ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারা প্রকৃতি, পোকা-মাকড় এবং অন্যান্য জীবজন্তু, যারা এই সমস্ত শস্য খেয়ে বেঁচে থাকে, তাদেরকেও বহু ক্ষেত্রেই এই শস্যগুলোর জন্যই বিষক্রিয়ায় মারা পড়তে হয়।

তাই এই সমস্ত বিপজ্জনক ফসলগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় হলো এদের উৎস মুখেই চিহ্নিত করে সনাক্তজ্ঞাপক সংকেত ব্যবহার করা, যাতে ভোক্তারা এদের ব্যবহার না করে। যেমন বিষের বোতলের গায়ে 'বিষ' কথাটা

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

লেখা থাকে বলেই আমরা সেই বোতল থেকে ঢেলে কোন কিছুই খাই না।

এই নিবন্ধে আমরা দেখাবো যে কোম্পানিগুলো দাবি করে যে তারা জিন-পরিবর্তিত খাদ্য চিহ্নিত করার পদ্ধতি বের করে ফেলেছে— কিন্তু এই দাবি ভ্রান্ত। তাই 'বিষ' লেখা নেই দেখে, সেই বোতল থেকে পানীয় খেলে বিষ খাওয়ার সম্ভাবনা যেমন থেকেই যাচ্ছে; এক্ষেত্রেও তাই বিপদের সম্ভাবনা বাড়ছে।

বিপদ ১: অপ্রমাণিত প্রযুক্তি

যে কোনও নতুন প্রযুক্তির দুটি দিক থাকে। তার মধ্যে একটি দিক এই যে, নতুন প্রযুক্তি মানেই তা এখনও নিশ্ছিদ্র কিনা তা আমাদের অজানা, বিশেষত সেটি ব্যবহারের দীর্ঘকালীন ফল আমাদের অজানা। তাই আমাদের এই জাতীয় নতুন প্রযুক্তির বিপদের দিকগুলি সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিপদ এড়ানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হয়। জিন পরবর্তিত খাদ্যের ক্ষেত্রেও আমাদের তাই করতে হবে। বিপদ সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে হবে ও তা কমিয়ে আনার প্রযুক্তি নির্মাণ করতে হবে।

খাদ্যদ্রব্য এমনই এক বস্তু যা বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না। তাই এক্ষেত্রে একটা পদ্ধতি হলো, ভোক্তা যেন তার পছন্দমতো, তার নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে জিন পরিবর্তিত খাদ্য এড়িয়ে চলতে পারে।

এই বিষয়ে যে সব দেশে ভোক্তাদের এই পছন্দের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে (ভারতে এখনও হয়নি) সেখানে খাদ্যদ্রব্যকে চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। যে সব খাদ্য দ্রব্যে ১ শতাংশের বেশি জিন পরিবর্তিত খাদ্য মিশে আছে সেগুলি বিশেষ প্যাকেটে মুড়ে বাজারের একটি বিশেষ এলাকাতেই কেবল বেচাকেনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্যাকেটের চেহারা (সাধারণত এই প্যাকেটগুলিতে একটি লাল ফিতে ছাপা থাকে) এবং বাজারের কোন্ অংশে সেটি বিক্রি হচ্ছে তা দেখে ভোক্তা জানবে যে সেটি জিন পরিবর্তিত খাদ্য, এবং তার ভিত্তিতে সে সেটি কেনার বা না কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্যার সমাধান হবে মনে হলেও আমরা দেখাবো যে এই পদ্ধতিটি মোটেই বৈজ্ঞানিক নয়— এমনকি যে বিপদটি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এত আয়োজন, এই পদ্ধতিটি সেই বিপদের পরিমাণ একটুও কমায় না।

এই পুরো পদ্ধতিটি কতটা কার্যকর হবে তা নির্ভর করছে সাধারণ খাদ্যে জিন পরিবর্তিত খাদ্য মিশে থাকার পরিমাণ আমরা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারছি কিনা তার ওপর। মনে রাখা দরকার, সাধারণ খাদ্য ও জিন পরিবর্তিত খাদ্যের আকৃতি ও বহিঃস্থ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে তাদের মধ্যে ফারাক করা যায় না। এগুলি পৃথক করতে গেলে একেবারে গোড়াতেই দুটো একেবারে আলাদা কৃষিক্ষেত্র চিহ্নিত করে সে দুটোর চাষ করতে হবে। অর্থাৎ পৃথকীকরণ করতে হবে একেবারে উৎসমুখেই। বিপদ ঘটে ঠিক এখানে এসেই।

বিপদ ২: পৃথকীকরণ কি সম্ভব?

কিন্তু উৎসমুখেই এই 'ভেজাল' বোঝা কার্যত অসম্ভব। প্রকৃতি-জাত খাদ্যে জিন পরিবর্তিত খাদ্যের মিশেল বা সাদা বাংলায় ভেজাল কমানো বা দূর করার এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে যা প্রতিষ্ঠিত তা হলো অর্থনৈতিক উৎসাহ প্রদান। 'ভেজাল' খাদ্যের বিক্রয়মূল্য 'প্রাকৃতিক খাদ্যের' চেয়ে বহু গুণ কম। ধরে নেওয়া হয় যে কৃষক তার নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থেই উৎসমুখে এই পৃথকীকরণ করে তবেই খাদ্যশস্য বাজারে আনবে।

ব্যক্তি-কৃষকের পক্ষে আবার এই পৃথকীকরণ অসম্ভব, কেননা এই পদ্ধতি অতিরিক্ত খরচ সাপেক্ষ, যা কৃষিকাজের প্রতিটি ধাপে নিয়ম করে পালন করতে হবে এবং পৃথকীকরণের প্রতিটি ধাপ ব্যক্তি কৃষক নিজে নিয়ন্ত্রণও করে না। দু-একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা স্পষ্ট হবে। সেচের জলের ওপর কৃষকের প্রায় কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই, সেই সেচের জলে জিন পরিবর্তিত খাদ্যের বীজ সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে, যা উপযুক্ত মাটিতে গাছে রূপান্তরিত হবে এবং 'ভেজাল' হিসাবে প্রাকৃতিক খাদ্যে ঢুকে যাবে। এই ভেজালটি সম্পর্কে কোনও ধরনের পূর্বানুমান যেহেতু সম্ভব নয়, তাই এই ভেজাল প্রতিরোধের কোনও কার্যকর পদক্ষেপও নেওয়া সম্ভব নয়!

চাষের জন্য যে বলদ চাষি ব্যবহার করে, সেই বলদের খাদ্য চাষি বাজার থেকে কেনে। সেই খাদ্যে জিন পরিবর্তিত শস্য থাকলে তার এক অংশ গোবর হিসাবে ঐ কৃষিক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে। এছাড়াও স্বাভাবিক পরাগ-মিলন পদ্ধতিতে, বায়ুবাহিত বা পতঙ্গ-বাহিত হয়ে দূরবর্তী জিন পরিবর্তিত ফসলের খেত থেকে পরাগ এসে প্রাকৃতিক ফসলকে নিষিক্ত করতে পারে। তাই ব্যক্তি-কৃষকের পক্ষে কৃষিকাজের প্রতিটি ধাপে প্রাকৃতিক ফসলে জিন প্রযুক্তি জাত ফসলের ভেজাল রোখা বাস্তবত অসম্ভব। এই কারণেই ব্যক্তি কৃষকের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উৎসাহ দান পদ্ধতি গ্রহণ করে বাজারে কেবলমাত্র 'প্রাকৃতিক ফসল'-এর যোগান নিশ্চিত করার বিষয়টি বিশ্বে কোথাও সফল হয়নি।

এবার আসা যাক বড় আকারের বাণিজ্যিক কৃষি খামারের বিষয়ে। ব্যক্তি-কৃষক বহু যুগ ধরে যে সাবেকি কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে, আধুনিকতার নামে বড়ো বড়ো বাণিজ্যিক কৃষি খামারগুলো সেই একই সাবেকি কৃষি পদ্ধতিই ব্যবহার করে, শুধু তারা প্রতিটি ধাপকে বহুগুণ বাড়িয়ে নেয়, আর যন্ত্রের ব্যবহার বেশি করে। এই কৃষি পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয় যে সমগ্র কৃষিক্ষেত্র জুড়েই প্রাকৃতিক ফসল উৎপাদিত হচ্ছে, তাই এই পদ্ধতির কোনও ধাপেই ফসল পৃথকীকরণের কোনও ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকে না। বাণিজ্যিক কৃষি-খামারে বলদের বদলে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ট্রাক্টর জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার মাধ্যমে এক জাতীয় ফসলে অন্য জাতীয় ফসলের ভেজার চালান আরও সহজ হয়ে যায়। ট্রাক্টরের টায়ার, ফলা ইত্যাদি হাল-বলদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ভেজাল এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে চালান করে। মাড়াই কলের মাধ্যমেও একই কাজ হয়। মাড়াই কল থেকে জিন পরিবর্তিত ফসলের কণা পুরোপুরি সরানোর কোনও পদ্ধতি আজও নেই। তাদের বিপুল আকারের জন্য বড়ো খামারগুলি খাদ্য বাজার-জাত করার ধাপটি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কৃষিপণ্য বস্তাবন্দী করার জন্য তারা যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নেয়, সেখানেও এই পৃথকীকরণ অসম্ভব। তারপর আছে মাল পরিবহন। পরিবহন হলো খাদ্যে ভেজাল যুক্ত করার মূল হোতা। এখানেও জিন পরিবর্তিত খাদ্যের ভেজাল রোখার জন্য কোনেও বাস্তব নজরদারির ব্যবস্থা নেই। তাই বাজারের খাদ্যে জিন পরিবর্তিত খাদ্যের ভেজাল থাকেবে না, এটা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়ে ভোক্তাদের আশঙ্কা অমূলক তো নয়ই, বরং এর যথেষ্ট সারবত্তা রয়েছে। এই কারণে অনেক দেশে জিনপ্রযুক্তি-জাত ফসল পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন খেতে যদি প্রাকৃতিক ফসল আর জিনপ্রযুক্তি-জাত ফসল চাষ হয়, তাদেরও পৃথক রাখা অসম্ভব। ফসল তো শুধু খাওয়াই হয় না, তা থেকেই আসে পরবর্তী মরশুমের ফসলের বীজ। এই বীজেও ঢুকে পড়ে জিনপ্রযুক্তি-জাত ফসলের ভেজাল। তার প্রধান কারণ, খাদ্য শস্যগুলির পরাগ মূলত বায়ু-বাহিত হয়ে, আর কয়েকটি ফসলের ক্ষেত্রে পতঙ্গ-বাহিত হয়ে এক উদ্ভিদ থেকে অন্য অন্য উদ্ভিদের ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে, আর তা থেকেই তৈরি হয় ফল, বা শস্য। একটি ক্ষেতের জিনপ্রযুক্তি-জাত ফসলের পরাগ পাশের ক্ষেতের ফসলকে নিষিক্ত করতেই পারে। এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে যাওয়ার কোনও বাধা নেই। ফলে প্রাকৃতিক ফসলের মধ্যে ঢুকে পড়বে জিনপ্রযুক্তি-জাত ফসলের জিন।

বিপদের দিক ৩ : কতটা ভেজাল?

'প্রাকৃতিক খাদ্য' এবং জিনপ্রযুক্তি-জাত খাদ্য পুরোপুরি পৃথকীকরণ করা যদি সম্ভব না হয় তবে পরবর্তী ধাপ হতে পারে 'প্রাকৃতিক খাদ্যে' জিনপ্রযুক্তি-জাত ফসলের পরিমাণ নিরূপণ করা, যাতে আমরা প্রাকৃতিক খাদ্যে ভেজালের পরিমাণসূচক কোনো সংকেত যোগ করতে পারি— ইউরোপ ও মার্কিন দেশে যা ' লেবেলিং' নামে খ্যাত।

এই ভেজাল যত সামান্যই হোক না কেন, সময়ের সাথে সাথে ভেজালের পরিমাণ পুঞ্জীভূত হয়। যেসব বিজ্ঞানীরা কোম্পানির টাকায় গবেষণা করেন না ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের দিয়ে একটি গবেষণা করিয়েছিলো। সেই গবেষণার ফল পৃথিবীর প্রায় সব কটি মান্য গবেষণাগার স্বীকার করে, ব্যতিক্রম শুধু জৈব প্রযুক্তির কোম্পানি মনস্যান্টো-র গবেষণাগার। সেই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখা যে অতি সামান্য পরিমাণ জিনপ্রযুক্তি-জাত খাদ্যও যদি প্রাকৃতিক খাদ্যে ভেজাল হিসাবে মিশে যায় তবে ১০, ২০ বা ৫০ বছর পর সেই ভেজাল বেড়ে কী অবস্থায় যেতে পারে। গবেষণার ফল হলো যে ভেজাল পুঞ্জীভবন শেষ পর্যন্ত ১ শতাংশ ছড়িয়ে যাবে ২০ বছরেই।

বিপদের চিত্র ৪: ভেজাল পরিমাপ করা যায় না!

জিন পরিবর্তিত খাদ্য 'লেবেলিং' করতে গেলে তাই প্রথমে প্রয়োজন প্রাকৃতিক খাদ্যে ঠিক কী পরিমাণ জিন পরিবর্তিত খাদ্যের মিশেল আছে তার নিখুঁত পরিমাপ করা। বর্তমানে এই পরিমাপের দুটি প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি রয়েছে— কিন্তু সেই পদ্ধতি দুটি এত সূক্ষ্ম পরিমাণে পরিমাপের যোগ্য ও মান্য পদ্ধতি নয়।

প্রথম পদ্ধতিটি হলো প্রাকৃতিক খাদ্যের জিন-ভাণ্ডারে বিজাতীয় জিন সমন্বিত অংশ ঠিক কটি আছে তা গুণে ফেলা এবং সেই সংখ্যা থেকে ভেজালের শতকরা হিসেব বের করা। বর্তমানে যে পরিমাপ পদ্ধতি চালু আছে সেই পদ্ধতি অনুসারে প্রাকৃতিক জিন-ভাণ্ডারের প্রতি দশ হাজার স্বাভাবিক জিনে যদি ৮০ টি বা তার বেশি জিন ভেজাল হিসাবে থাকে তবে আমরা তা পরিমাপ করতে পারি। কিন্তু আমাদের মাপতে হবে প্রতি ১০ হাজার প্রাকৃতিক জিন-ভাণ্ডার পিছু এমন ৫টি বিজাতীয় বস্তু যা কিনা আগামী দু দশকেও মাপা যাবে কিনা সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত নন। তাই সংখ্যা মেপে জিন প্রযুক্তি জাত ভেজালের শতকরা মাপ নির্ণয়ের এবং তার ভিত্তিতে লেবেলিং-এর পুরো পদ্ধতিটিই সন্দেহজনক ও অবৈজ্ঞানিক।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো অনুপাত-ভিত্তিক। এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ফসল ও জিন পরিবর্তিত ফসলের মধ্যে উপস্থিত একটি বিশেষ যৌগের মোট ওজনের অনুপাতের ভিত্তিতে ভেজালের শতকরা মান নির্ধারণ করা হয়। এই মান নির্ধারণে তাই প্রাকৃতিক ফসলের মধ্যে ঐ বিশেষ যৌগটির মোট ওজন কত তা আমাদের জানা প্রয়োজন। কিন্তু সেই বিশেষ মানটি কিছুতেই নিখুঁতভাবে জানা সম্ভব নয়। প্রথমত, যে কোনও প্রাকৃতিক ফসলের আদি যে বুনো গাছটির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এতই বেশি যে ঠিক কোন্ আদি গাছটি থেকে আমাদের শুরু করতে হবে তা আমরা জানি না, ফলে এই পদ্ধতিতে ভেজাল জানা একেবারেই অসম্ভব।

এছাড়াও খরচের বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখা দরকার। যদি ধরেও নিই যে আমাদের বর্ণনা করা পদ্ধতিগুলিই একেবারেই নির্ভুল, তাহলেও ভেজাল পরিমাপের জন্য অন্তত ছটি অত্যন্ত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ অত্যন্ত মহার্ঘ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন। একেকটি পরীক্ষা অন্তত ছবার করে না করলে সেই পরীক্ষার ফল বিশ্বাসযোগ্য হয় না। এমন একেকটি পরীক্ষার খরচ ইউরোপের যে কোনও মান্য গবেষণাগারে পড়ে ৩২০ ইউরো। সঠিকভাবে ভেজাল নির্ধারণ করতে পুরো খরচের পরিমাণ

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

দাঁড়াবে : ৩২০ × ৬ × ৬ = ১১৫২০ ইউরো। এই খরচটি পড়বে গম জাতীয় খাদ্যের জন্য। সবজি জাতীয় খাদ্যের জন্য খরচ হবে অন্তত দু গুণ। কোম্পানিগুলো স্বভাবতই একটা-দুটো পরীক্ষা একবার-দুবার করেই বলে দেয় যে ভেজালের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর— এতএব মাভৈ!

বিপদের দিক ৫ : দালাল বিজ্ঞানীদের সার্টিফিকেট

সারা পৃথিবী জুড়েই দেখা গেছে যে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী জিন-পরিবর্তিত সফল সংক্রান্ত গবেষণার ফলকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, সরকারি বিজ্ঞানী, আমলারা তাদের চূড়ান্ত হেনস্থা করেছেন। ছোট খাটো ঘটনার কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা এই বিষয়ে সব চেয়ে আলোড়নকারী ঘটনার কথাই এখানে বলবো।

ইংলন্ডে অতি মান্য গবেষণাগার রাওয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দুই প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী স্টানলি এড়ইন ও আরপাট পুসৎজাই ১৯৯৮ সালে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন যে, তাঁদের গবেষণার ফল থেকে জানা যাচ্ছে যে ইঁদুরকে যদি কেবলমাত্র জিন পরিবর্তিত আলু খাওয়ানো হয় তবে সেই সমস্ত ইঁদুরের বৃহদন্ত্রে প্রত্যাহার পরিবর্তন ঘটে, অনেক সময় ক্যান্সারও হয়। এই দুই বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণাপত্র অযোগ্য বিজ্ঞান বিষয়ক মান্য গবেষণা পত্রিকা লানসেট-এ প্রকাশের জন্য পাঠান। যখন এই গবেষণা পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষে আরও কিছু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী যখন এই গবেষণাপত্রটি পরীক্ষা করছিলেন, ঠিক সেই সময় অন্য এক মান্য বিজ্ঞান সংস্থা রয়াল সোসাইটি ঘোষণা করে যে এই দুই বিজ্ঞানীর 'গবেষণা'র ফল ভুল। মনে রাখা দরকার যে, এই সোসাইটি তখনও পর্যন্ত এই দুই বিজ্ঞানীর গবেষণাপত্র চোখেই দেখেন নি।

যে লানসেট পত্রিকা মনস্যান্টো সংস্থার গবেষণাগার থেকে প্রকাশের জন্য পাঠানো এমন কি জিন পরিবর্তিত আলু-র নানান গুণপনা সমন্বিত গবেষণাপত্রের পরীক্ষা প্রক্রিয়া দু মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করে তিন মাসের মাথায় তা প্রকাশ করেছেন, সেই একই কর্তৃপক্ষ এখন মনস্যান্টোর গবেষণার ফলের বিপরীত ফলকে প্রকাশ করতে সময় লাগায় ১৮ মাস।

পুসৎজাই-দের গবেষণাপত্রর সত্যতা নিরূপণের জন্য ল্যানসেট সম্পাদকমণ্ডলী সেই গবেষণাপত্রটিকে তিনজন ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানীর কাছে পাঠায়। এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের নিশ্চিন্ত করার জন্য পুসৎজাই তিনবার তাদের গবেষণাপত্র নতুন করে লিখে পাঠান। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে কোম্পানির টাকায় চলা গবেষণার মান ও সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য— বস্তুত এই প্রশ্ন উঠে গেছে। বিটি-বেগুনের ক্ষেত্রে মনস্যান্টো-মাহিকো সংস্থা যে 'গবেষণা-লব্ধ তথ্য' দিয়েছে, জৈবপ্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান, যদিও ভারত সরকার এই সন্দেহজনক তথ্যের ভিত্তিতেই বিটি-বেগুনকে ছাড়পত্র দিয়েছে। মনস্যান্টোর গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হওয়ামাত্র বিজ্ঞানী সেরালিনি সেই পরীক্ষা নতুন করে পরীক্ষা করে ভিন্ন তথ্য পেয়েছেন; এরপর তিনি নিজেই বিটি বেগুনের ওপর নতুন ধরনের পরীক্ষা করে মনস্যান্টোর বিটি বেগুন সংক্রান্ত প্রতিটি দাবিই নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

এই সমস্ত জাল তথ্য যে সমস্ত বিজ্ঞানী সত্য বলে প্রচার করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে, এমনকি যারা সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিতর্কও চেপে দিতে চায় (যেমন ঘটেছিল পুসৎজাই-দের ক্ষেত্রে) তাদের কথার ওপর নির্ভর করে জিন পরিবর্তিত খাদ্য সম্পর্কে মতামত তৈরি করার মধ্যে সাংঘাতিক বিপদ থেকেই যাচ্ছে।

আরও বিপদ: স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক সুরক্ষা

জিন পরিবর্তিত খাদ্যের উৎপাদন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে আমরা সেগুলিকে তিনটি প্রজন্মে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম প্রজন্মে আছে সেই সব ফসল বা খাদ্য, যেখানে আমরা কোনও এক কৃষি বিষয়ক কোনও সুবিধার জন্য ফসলটিকে পরিবর্তিত করেছি। যেমন বেঁটে প্রজাতির গম বা হলুদ রংয়ের ক্যাপসিকাম। দ্বিতীয় প্রজন্ম হলো সেগুলি যেখানে আমরা খাদ্যগুণ পরিবর্তিত করেছি, যেমন ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস, বা সোনালী ধান। আর তৃতীয় প্রজন্মের জিন প্রযুক্তি-জাত ফসল হলো সেগুলি, যেগুলোর মধ্যে আমরা বিজাতীয় প্রজাতির জিন ঢুকিয়ে পোকার বিরুদ্ধে যেমন বিটি তুলো বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে (যেমন বন্যা, খরা, অতিরিক্ত ক্ষারীয় মাটি ইত্যাদি) প্রতিরোধী করে তোলার চেষ্টা চালাই।

এইবার দেখা যাক এই তিন প্রজন্মের জিন পরিবর্তিত খাদ্যের বিষয়ে আমরা ঠিক কী কী পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে বলছি যে তারা খাদ্য হিসাবে নিরাপদ বা ক্ষতিকর। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার প্রাথমিক এবং প্রধান পদ্ধতি হলো একটি আপেক্ষিক পদ্ধতি। একটি জিন পরিবর্তিত খাদ্যকে তার সমতুল্য প্রাকৃতিক খাদ্যের সঙ্গে আমরা সব বিষয়ে তুলনা করি। এই তুলনায় যদি দেখা যায় যে জিন পরিবর্তিত খাদ্য সব ক্ষেত্রেই তার প্রাকৃতিক সাথীটির সঙ্গে সমতুল্য (বা বেশি ভালো), তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল নতুন জিনের জন্য নতুন ধর্মের জন্য যা কিনা জিন পরিবর্তিত খাদ্যে উপস্থিত ও প্রাকৃতিক খাদ্যে অনুপস্থিত আর কেবলমাত্র এই ধর্মের জন্য তারা পৃথক, তাহলে বিজ্ঞানীরা বলেন যে এই জিন পরিবর্তিত খাদ্যটি প্রাকৃতিক খাদ্যের সমতুল্য; এই মূলত সমতুল্য পরীক্ষায় জিন পরিবর্তিত খাদ্যটি উত্তীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের জিন পরিবর্তিত খাদ্যের জন্য এই সমতুল্যতার পরীক্ষা করার কোনও পদ্ধতি বিজ্ঞানীরা আজও জানেন না। যে অল্প কটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে সেগুলিরও গ্রহণযোগ্যতা নেই। বারবার পরীক্ষা করলে সেগুলির ফল একই হয় না। পরীক্ষাগুলি পরীক্ষকের দক্ষতা, কী কী রাসায়নিক কীভাবে ব্যবহার করা

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

হয়েছে ইত্যাদি নানান অ-বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। তাই বেঁটে প্রজাতির গম (প্রথম প্রজন্মের জিন-পরিবর্তিত ফসল) নিয়ে কোনও বৈজ্ঞানিক বিতর্ক নেই। এটি প্রথম প্রজন্মের— সমতুল্যতার পরীক্ষায় এটি প্রায়শই উতরে যায়। কিন্তু বিটি বেগুন বা সোনালী ধান বিতর্ক রয়েছে।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি নিয়ে বিজ্ঞানীরা চিন্তিত, তা হলো জিন পরিবর্তিত দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের খাদ্য ঠিক কতটা পরিমাণ নিয়মিত খাওয়া মানুষের পক্ষে নিরাপদ। এই 'নিরাপদ' পরিমাণ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনও সহমত নেই। একদল বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, যে কোনও সামান্য পরিমাণ জিন প্রযুক্তিজাত খাদ্যই যে কোনও জীব, অতএব মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এই নিয়ে বিতর্ক চলছে, চলবেই। তাই জিন পরিবর্তিত খাদ্য মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর নয় শুনে নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই।

একটা খুব সহজ প্রশ্ন তুলে এই প্রসঙ্গের ইতি টানবো। প্রকৃতিতে যত ধরনের শাক-সবজি-দানা ফসল পাওয়া যায় তার সামান্য একটা অংশই কেবল মানুষের খাদ্য। যুগ যুগ ধরে বিবর্তন এবং মানুষের বিপুল অধ্যবসায়ের ফলে আমরা আমাদের জন্য প্রকৃতিতে লভ্য খাদ্য-শস্য চিনতে শিখেছি। এটাই আমাদের স্বীকৃত খাবারের ঝুড়ি (Basket)।

মুনাফা-লোভী বানিয়ারা প্রথমে খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে বণ্টনে অসাম্য প্রতিষ্ঠা করে মুনাফা নিশ্চিত করে। কিন্তু মুনাফার হার কমলে সবাই জানে মুনাফার ক্ষেত্র বাড়াতে হয়। খাদ্য ক্ষেত্রে মুনাফার হার বাড়ানোর তাগিদে মুনাফার ক্ষেত্র বর্ধিত করে তারা তৈরি করে জিন-পরিবর্তিত খাদ্য— যাতে খাদ্য ক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় হয়, একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে তাদের মুনাফার হার আরও বাড়ে।

প্রকৃতিকে 'জয়' করার বানিয়াবৃত্তির যে জীবনদর্শন, যেখানে সব কিছুই মুনাফার তাড়নায় পরিচালিত, সেই জীবনবোধ বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে তাড়িত করলেও আমরা যেন ভুলে না যাই যে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যেই মানব সমাজের সভ্যতার উত্তরণ, প্রকৃতির স্বাভাবিক অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করলে প্রকৃতির প্রতিশোধ বড়ো ভয়ানক। বিপুল পরিমাণ মৃৎপাত্র উৎপাদনের তাড়নায় মৃৎপাত্র তৈরির উনুনের জ্বালানি হিসেবে একসময় নির্বিচারে অরণ্য নিধনের ফলে অত বড়ো ও দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষিত মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পা সভ্যতা বিলুপ্ত হয়েছে। আর মনস্যান্টো জাতীয় কোম্পানির বয়স তো আমাদের দেশের একটি নিমগাছের বয়সের চেয়েও কম। কিন্তু তারাই অধিক মুনাফার জন্য ফন্দি ফিকির করে মানুষের মুখের গ্রাসকে পণ্যে পরিণত করে মানবসমাজকে পণবন্দী করে রেখেছে। সচেতনতা আর সক্রিয়তাই এই বন্দীদশা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে।

লাদেনের 'জেহাদ' ও সন্ত্রাস

১৮ পৃষ্ঠায় পর

গেলেন, আমেরিকা 'সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধের' নামে তার থেকে বহু শত গুণ মানুষকে হত্যা করলেও আমেরিকার এই নির্বিচার আগ্রাসী নীতি যেন এক প্রকার বৈধতা পেয়ে গেল।

সবশেষে, লাদেনের মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। যেভাবে একজন নিরস্ত্র মানুষকে আমেরিকা ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করলো এবং তার মৃতদেহটি আত্মীয়-পরিজনদের হাতে তুলে না দিয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হলো, তার থেকে জঘন্য কাপুরুষোচিক কাজ আর কিছু হতে পারে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট দুনিয়ার অধীশ্বর, তার খুনে বাহিনী দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে গিয়ে যাকে খুশি হত্যা করতে পারে, এমনই এক বার্তা যেন দেওয়া হলো এই ঘটনা মারফত। কিন্তু এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এমনকি মুসলিম দুনিয়াতেও কোনো আলোড়ন উঠল না। যে মুসলিম জনগণের ওপর হামলা চালানোর বিরুদ্ধে তার লড়াই ছিল, যে মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা তার সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল, সেই মুসলিম সমাজ কেন তার আত্মদানে ন্যূনতম সাড়া দিল না? সন্ত্রাসবাদী কাজের পরিণতি বুঝি এরকমই হয়! যে জনগণের মুক্তির জন্য লড়াই, সেই জনগণ থেকেই ঘটে যায় চরম বিচ্ছিন্নতা!

তবে লাদেনের মৃত্যুতে আল-কায়দার কর্মকাণ্ড বা মুসলিম জনগণের প্রতিরোধ শেষ হয়ে যাবে, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। আরব দুনিয়াতে গণ-জাগরণের যে নতুন পর্ব শুরু হয়েছে, তার ঢেউ কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে তা বলা মুস্কিল। তবে এই নব-জাগরণ যে মুসলিম দুনিয়ার মৌলবাদীদের দাপট কমাবে, তার সম্ভাবনা যথেষ্ট। গণ-উদ্যোগের বিস্ফোরণে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নতুন পদ্ধতি উঠে আসা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে হয়। এর পরেও হয়তো লাদেন বীর হিসাবে ধর্মগুরু হিসাবে পূজিত হবেন, আর সবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দুর্বলের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে সন্ত্রাসের অস্তিত্ব থেকে যাবে আরো দীর্ঘ দীর্ঘদিন।

তথ্যসূত্র :

১. Cook, Robin (2005-07-08). ‘‘The struggle against terrorism cannot be won by military means’’. London : Guardian Unlimited.*http://www.guardian.co.uk/terrorism/story/0.12780.1523838.00.html*.
২. ১৯৯৭ সালের মার্চ সংবাদ-মাধ্যম সিএনএন-কে দেওয়া লাদেনের সাক্ষাৎকার।
৩. ২০০৪ সালের নভেম্বরে আল জাজিরাকে দেওয়া লাদেন-এর সাক্ষাৎকার।
৪. ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০১-এ ডেইলি উমর নামে এক পাকিস্তানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ওসামা বিন লাদেনের সাক্ষাতকার থেকে উদ্ধৃত।
৫. Website Wikepedia.org থেকে সংগৃহিত।
৬. ডেইলি উমর-কে দেওয়া পূর্বোক্ত সাক্ষাতকার।
৭. সিএনএন-কে দেওয়া পূর্বোক্ত সাক্ষাতকার।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

শতবর্ষে স্মরণ

প্রসঙ্গ: ফয়েজ আহমদ ফয়েজ

ধারা চট্টোপাধ্যায়

যে কবি লিখেছিলেন: "*কী হবে সে কবিতা দিয়ে, দুনিয়া জাগাতে পারে না যা? / কী হবে জলভরা সে চোখ দিয়ে, তা যদি ভাসাতে না পারে গোটা শহরকে*"; যিনি ১৯৪৭-এ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগের মধ্যে দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে এক বিষাক্ত চক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করে গভীর হতাশায় লিখেছিলেন: "*এই কৃত্রিম আলো, এই রাত্রি-দংশিত ভোর— এ নয় আমাদের সেই উজ্জ্বল সকাল— যার জন্য আমরা বসেছিলাম অ্যাতো দিন ধরে*"; যিনি ছিলেন পাকিস্তানের সেই প্রায় বিরল এক ব্যক্তিত্ব, ১৯৭১-এ পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের রক্তাক্ত জন্মকে যিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন অকুতোভয়ে— এ বছর সেই কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ-এর জন্মশতবার্ষিকী।

তাঁর জন্ম হয়েছিল অবিভক্ত ভারতের শিয়ালকোটে। নিতান্ত বাল্যকালেই তাঁর কানে ভেসে এসেছিল রুশ বিপ্লবের কামান গর্জনের বজ্রধ্বনি, তার ধারাবাহিকতায় সারা জীবন ধরে তাঁর চোখে আঁকা ছিল সমাজবদলের স্বপ্ন। আবার গালিবের অবিস্মরণীয় গজলও ঝঙ্কার তুলেছিল তাঁর মননে। ফলে সারা জীবন ধরেই তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়ে চলেছে রোম্যান্টিকতা ও সমাজ-চেতনার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। তাঁর উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছিলেন হসরত মোহানি, যিনি একদিকে উর্দু কবিতায় প্রথম এনেছিলেন বিপ্লবের শ্লোগান, এবং অন্যদিকে যিনি ভারতে সর্বপ্রথম ১৯২১-এ তুলেছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি। আর এক উর্দু সাহিত্যিক সাজ্জাদ জাহিরের সঙ্গী হিসেবে ফয়েজও ছিলেন ১৯৩৫-এ ভারতে প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রথম সর্বভারতীয় মঞ্চ প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা— যার প্রথম সম্মেলনে তিনি লিখেছিলেন: "*কথা বলো ঠোঁট তো খোলাই আছে/ কথা বলো— তোমার জিভও তো তোমার নিজেরই/ কথা বলো— সত্য এখনও বেঁচেই আছে/ কথা বলো, বলো তোমার যা বলার আছে— সব কিছুই।*"

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের সময় তিনি লিখেছিলেন : "*কোথা থেকে ভেসে এসে কোন্ পথে চলে গেলো ভোরের বাতাসে আনা ছবি/খবরই পেলো কোনও পথের প্রদীপ/ পিষে ফেলা এই রাত এখনও তো আরও বহু বাকি/ হৃদয় আর দু'চোখের মুক্তির দিন বহু দূর/ শেষ লক্ষ্য বহু দূর, আরও বহু পথ চলা বাকি।*" সেখানকার কমিউনিস্ট আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। পাকিস্তানে চলে যাবার পর সে বছরই প্রতিষ্ঠিত 'পাকিস্তান টাইমস্'-এর সম্পাদক হিসেবে তিনি শ্রমিক-কৃষক-নারী ও যুব-ছাত্রদের বঞ্চনা ও দাবিদাওয়া নিয়ে তিনি বিশেষ সোচ্চার হতেন। প্রতিটি বিষয়ে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিকতা-বিরোধী অবস্থানের জন্য কোনোদিনই সেদেশের শাসকশ্রেণী তাঁকে সুনজরে দেখে নি। অবশেষে চক্রান্তমূলকভাবে ১৯৫১-তে কুখ্যাত রাওয়ালপিন্ডি মামলায় অন্যান্য কমিউনিস্টদের মতো তাঁকেও বছরের পর বছর আটক রাখা হয়েছিল রুদ্ধ কারার অন্তরালে। জেলে বসেই তিনি লিখেছিলেন সেই অবিস্মরণীয় লাইনগুলি: '*ছিনিয়ে নিয়েছে সব কাগজ-কলম— তাতে দুঃখ কীসের?/ হৃদয়ের রক্তে আঙুলগুলি তো রাঙিয়ে নিয়েছি আমি।/স্তব্ধ করেছে কণ্ঠ আমার— তাতেই বা কী আসে যায়?/শিকলের প্রতিটি মোড়ককে যে মুখর করেছি আমি।*" পরবর্তীকালে ১৯৬৫-তে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়েও তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদের জোয়ারে গা ভাসাতে অস্বীকার করে শাসকদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে দুঃখ, যন্ত্রণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নতুন এক সমাজ গড়ে তোলার আর্তি ও স্বপ্ন— শুধু পাকিস্তানের নয়, সারা বিশ্বের মানুষেরই। শুধু শিল্পর জন্য শিল্প রচনার প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন তিনি। অগ্রণী এক প্রগতিশীল কবি হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন সারা দুনিয়ায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাবলো নেরুদা, নাজিম হিকমত— সমকালীন এই কবির নাম উচ্চারিত হতো তাঁদের পাশেই। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে। ১৯৬২-তে তিনি তাঁর কবিতার জন্য আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার পেয়েছিলেন, এবং পাকিস্তান সরকারের স্পষ্ট নিষেধ সত্ত্বেও সেই পুরস্কার নিয়েছিলেন। পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, "*আমি নিশ্চিত যে, মানবসমাজ কখনই শত্রুর হাতে পরাজয়কে মেনে নেবে না, বরং আবার উঠে দাঁড়াবে বিজয়চূড়ায়, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করবে— যুদ্ধ, ঘৃণা, নির্যাতন বা বিদ্বেষের উপর নয়, বরং পার্সি কবি হাফিজ যেমন বলেছিলেন: "ভেঙে পড়া অনেক ভিত্তিস্তম্ভ আমি দেখেছি/শুধু ভালোবাসাই সেই ভিত্তি, যা কখনও ভাঙে নি।*"

১৯৭৭-এ পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থানের পর সে দেশে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়ে হওয়ায় তিনি চলে যান বেইরুটে— প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)-র প্রধান ইয়াসার আরাফাতের পাশে। সেখানে তিনি আফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র 'লোটাস'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইজরায়েলের সামরিক বিমান যখন বেইরুটে পিএলও-র ঘাঁটিতে সামরিক বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করছে, তখন তিনি লিখছেন 'এক প্যালেস্টাইনি শিশুর জন্য ঘুমপাড়ানি ছড়া': "*কেঁদো না কেঁদো না বাছা/এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে*

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

তোমার মা... কাঁদতে কাঁদতে/আর ঘুমিয়েছে বাবাও... সব দুঃখ থেকে চিরদিনের মতো বিদায় দিয়ে...।"

ফয়েজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে শেষ করা যাক তাঁর অনুসৃত নতুন এক কবিতার রীতিতে লেখা একটি 'বোল' দিয়ে:

বল্, এখনও স্বাধীন তোর ঠোঁট
বল্, তোর জিভ এখনও তো তোরই
তোর কোমল দেহ এখনও তো তোরই
বল্, জীবনটাও এখনও তো তোরই
দ্যাখ্, কামারের দোকানে দ্যাখ্
গনগনে আগুন আর টকটকে লোহা
গলে গলে যাচ্ছে, দ্যাখ্, তালাদের হাঁ
শিকলের ছড়ানো আঁচল
এটুকুই অনেক সময়
দেহ, জিভ মরবার আগে
বলে যা, বেঁচে আছে সত্য এখনও
বল, যা কিছু বলার আগে বলে ফ্যাল্ আজ।

মার্চ ১৯৭১

ফয়েজ আহমদ-এর কবিতা

আমার শরীর থেকে দূরে থাক : বাংলাদেশ

সাজাবো, তবে কিভাবে সাজাবো গণহত্যার শোভাযাত্রা
আমার রক্তের চীৎকারে কাকে আকর্ষণ করবো?
আমার দুর্বল দেহে কতটুকুই বা রক্ত আছে?
এতে কোনো প্রদীপ জ্বলবে না
সুরার গ্লাস ভরবে না
জ্বলবে না আগুনের স্ফুলিঙ্গ আর মিটবে না তৃষ্ণা।
আমার ক্ষত বিক্ষত দেহে কতটা রক্ত আছে?
অথচ আমার শরীরের প্রতিটি শিরা বিষে ভরা।

যদি তুমি আমার যে কোনো শিরা কেটে ফেলো
প্রতিটি রক্তের ফোঁটায় বেরিয়ে আসবে
সাপের গরল
প্রতি ফোঁটায় শতাব্দীর বেদনা আর আকাঙ্ক্ষার নিদারুণ যন্ত্রণা
প্রতি ফোঁটায় মুদ্রিত হচ্ছে ক্রোধ ও দুঃখের উত্তাপ।

আমার কাছ থেকে দূরে থাক, আমার শরীর বিষাক্ত নদী
আমার কাছ থেকে দূরে থাক, আমার দেহ মরুতে পোড়াকাঠের গুঁড়ি
যদি একে জ্বালাও তো দেখবে, আঙ্গিনার বাগানে
এটা দাউ দাউ জ্বলছে।

কিন্তু জুই চামেলীর বদলে আমার হাড়ের কাঁটা যদি ছিটাও,
তবে তা মাঠে পাহাড়ে ছিটকে পড়বে।
সকালের প্রসাধনীর সুগন্ধীর পরিবর্তে
আমার পোড়া হৃদয়ের ছাই ছিটিয়ে দাও
সাবধান, আমার কাছ থেকে দূরে থাক,
কারণ আমার হৃদয়ে রক্তের পিপাসা।

মার্চ ১৯৭১

অনুবাদ— জাফর আলম

লাদেন ও সাম্রাজ্যবাদ ২০ পৃষ্ঠায় পর

বিরোধিতা ও নিন্দা করতে দ্বিধা করেন নি।

অবশ্য এর সাথেই সাথেই প্রশ্ন উঠেছে: লাদেনকে আমরা কোন্ দৃষ্টিতে বিচার করবো? তিনি কি একজন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যোদ্ধা ছিলেন? সেই লড়াই চালাতে গিয়েই 'শহীদ' হলেন? এটা অনস্বীকার্য যে, লাদেন ও তার অনুগামীরা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে তাদের মার্কিন-বিরোধী জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও আদর্শ কী ছিল? লাদেন শুরু করেছিলেন আফগানিস্তানে রুশ দখলদারির বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কার্যত প্রতিনিধি হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি সারা দুনিয়ায় ইসলামি মৌলবাদী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যত একজন মেশিয়াতে পরিণত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে বন্দুক তাক্ করলেও, এবং প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে প্রকাশ্যে অবস্থান নিলেও, শেষ পর্যন্ত মার্কিন দেশের, এবং সারা দুনিয়ার, যে কোনো মানুষই তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। মার্কসবাদীরা অবশ্যই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, কিন্তু সেই সশস্ত্র সংগ্রামকে অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে গণসংগ্রামের ভিত্তিতে। লাদেনের সশস্ত্র জেহাদের পিছনে সেই ভিত্তি আদৌ ছিল না। কার্যত গণসংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক-বিরহিত সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের পথ অতীতে আমাদের দেশের ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল থেকে শুরু করে রাশিয়ার নারোদনিকরা বা আইরিশ বিপ্লবীরা অনেকেই অনুসরণ করেছেন। তবুও তাঁরা সঠিকভাবেই আমাদের কাছে শহীদের মর্যাদা ও শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন, কেননা তাঁদের লক্ষ্য অতি অবশ্যই ছিল মহান ও সমর্থনযোগ্য - দেশ থেকে বিদেশি শাসনের অবসান বা সমস্ত মানুষের শোষণমুক্তি। কিন্তু লাদেনের সম্পর্কে সে কথা বলার তো কোনো উপায় নেই। তার পথ অনুসরণ করে দেশে দেশে যে সব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলছে, তার শিকার তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সচেতনভাবেই করা হচ্ছে ব্যাপক সাধারণ মানুষকে। আর তাছাড়াও ইসলামি মৌলবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার জেহাদ তো সাধারণ মেহনতি মানুষদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করছে এবং শেষ বিচারে, সাম্রাজ্যবাদীদের ও বিভিন্ন দেশের শাসকশ্রেণীরই সুবিধে করে দিচ্ছে। তাহলে? লেনিন-বর্ণিত 'দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জমা-খরচের হিসেবে' বিচার করলে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই গড়ে তোলার পথে সুস্পষ্ট প্রতিবন্ধক লাদেনকে ও তাদের অনুসৃত বিভেদসৃষ্টিকারী ও ক্ষতিকারক পথকে আমরা 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারি ?

তাই অন্যায়ভাবে লাদেনকে হত্যা করার জন্য গত দুই শতাব্দীর সবচেয়ে সন্ত্রাসী শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যই আমরা নিন্দা করবো, কিন্তু তাই বলে তাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'শহীদ'-এর মর্যাদা বা স্বীকৃতি দেওয়াটা হবে মারাত্মক বিচ্যুতি, এবং এতে করে মহান লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদেরই অমর্যাদা করা হবে।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

রবীন্দ্র নাট্যপ্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা ও রাষ্ট্র-শিক্ষক-শিষ্য সংবাদ

অংশুমান ভৌমিক

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে কিছু লিখতে বসলে পূর্বসূরী মহাজনদের রচনাসাগর মন্থন করে থেকে-থেকে গণ্ডুষ আহরণ করে যত্রতত্র ছিটোনোর একটি প্রথা বহুল প্রচলিত। এমনকী কোনো নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথকে পড়তে গেলে বুঝতে গেলেও ধরতাইটুকু পেতে হয় ঐ অনন্ত মহাজনপদ থেকে। নচেৎ সেটি নস্যাৎ হবার আশঙ্কা থাকে। যে কেতাবি রেওয়াজের কথা বলা হচ্ছে তার আওতায় এই রচনাটি পড়ছে না। রবীন্দ্রচর্চার সারস্বত অঙ্গনে যা আবশ্যিক, সাময়িকপত্রে তা বিড়ম্বনাদায়ক। বস্তুত গত চারশো বছরে উইলিয়াম শেকসপিয়ারকে নিয়ে তো কিছু কম লেখাজোকা হলো না। সাহেব-মেমসাহেবরা যা শুরু করেছিলেন, তা এখন তামাম দুনিয়ায় নিত্যনবতরঙ্গের শীর্ষে আরোহণ করে ক্রমসঞ্চারমান। তার কলেবর ও বিস্তৃতি রবীন্দ্রচর্চার বহুগুণ। মজার ব্যাপার এই যে সেখানকার কেতাবি রেওয়াজ অন্যরকম। শেকসপিয়ারকে নিয়ে দু-চার কলম লিখতে গেলে গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা-সকালে মনপ্রাণ দিয়া রে বলে পদে পদে নাক খত দিতে হয় না। কোনও নিরঙ্কুশ গুরুবাদ সেই খোলা উঠোনে চোখ রাঙায় না। শিষ্যকে এ-গুরু ও-গুরুর চরণ ছুঁয়ে মাধুকরী ভিক্ষা করে বেড়াতে হয় না। আরও তাৎপর্যপূর্ণ কথা, এই গুরু-শিষ্য সংবাদে রাষ্ট্রের কোনও অভিভাবকত্ব থাকে না।

এই উৎকণ্ঠাটিকে পশ্চাৎমস্তিষ্কে রেখে রবীন্দ্রনাথের *মুক্তধারা* নাটকের একটি অংশকে এই সময়ের চোখ দিয়ে মন দিয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করব আমরা। যারা রবীন্দ্রজীবী, অথবা যাদের নিয়মিত পাঠ-অভ্যাসের মধ্যে অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথ আছেন, তাদের রবীন্দ্রনাথ পাঠ ও পুনর্পাঠে প্রায়ই নতুন নতুন আবিষ্কারের উল্লাস থাকে। হঠাৎ আলোর ঝলকানি থাকে। মনে হয়, এই কথাটি এতবার পড়েছি, এতবার দেখেছি, তবু এমন ভাবে কখনও নাড়া দেয়নি তো! এমন গভীর ব্যঞ্জনা সর্বাঙ্গে মেখে তাকে পাইনি তো! আমাদের মনে হয়েছে, *মুক্তধারা* নাটকটিকে আজ নতুন করে পড়া দরকার। তাকে রূপক নাটক, তত্ত্বাশ্রয়ী রচনা বলে তাকের এক দিকে তুলে না রেখে তার ভিতরকার কোনো কোনো কথা ফিরে ফিরে পড়া উচিত। সমকালের আয়নায় তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখা উচিত। তাহলে অতীতকে তো বটেই, ভাবীকালকেই আমরা চিনে নিতে পারব।

মুক্তধারা নাটকটি ১৯২২ সালের। ইউরোপ থেকে ফিরে আসার দু মাসের মধ্যে শান্তিনিকেতনে বসে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। উৎসমুখ নিহিত ছিল *প্রায়শ্চিত্ত* নাটকে। সেই নাটকের কোনো কোনো অংশ *মুক্তধারা*-য় পুনরুদ্ধার করেছিলেন তিনি। হপ্তা খানেক লেগেছিল লিখতে। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের পৌষ-সংক্রান্তিতে যবনিকা পড়েছিল, এমনটি জানিয়ে গেছেন স্বয়ং নাট্যকার। তাঁর জীবৎকালে নাটকটি বেশ কয়েকবার পঠিত হয়। শান্তিনিকেতনে এর একটি প্রযোজনার পরিকল্পনাও করেছিলেন তিনি। সেটি হয়ে ওঠেনি। তবে ১৯২৫ সালেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা এর প্রথম অভিনয় করে। পরবর্তী কালে গণনাট্য সংঘ (১৯৪৭) ও বহুরূপী (১৯৫৯) *মুক্তধারা* প্রযোজনা করেছে, শম্ভু মিত্রের পরিচালনায়। রবীন্দ্রজন্মের ১২৫ বছরে নাটকটিকে সমকালীন মনে হয়েছিল বহরমপুরের প্রদীপ ভট্টাচার্যের। নয়ের দশকে (১৯৯৬) কুমার রায়ের নির্দেশনায় আর একবার *মুক্তধারা* মঞ্চে এনেছে বহুরূপী। কুমারবাবুর নির্দেশনায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগও *মুক্তধারা* মঞ্চস্থ করেছে। তেহরি ও নর্মদা বাঁধ নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে এই নাটকটিকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে করেছিলেন পরিবেশবাদী আন্দোলনের অগ্রসৈনিকরা। শ্যামলী খাস্তগির ও রীতা গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলাধর্মী-র উদ্যোগে *মুক্তধারা*-র কয়েকটি অভিনয় হয়েছিল দিল্লিতে (১৯৯১)। উর্দু তর্জমায়। গুজরাটি ভাষায়ও মুক্তধারা অভিনীত হয়েছে ওই একই সময়। এগুলির অভিঘাত নর্মদার ঘাঁটি অবধি পৌঁছয়নি। সাম্প্রতিক কালে উত্তর ২৪ পরগনার দুটি তরুণ নাট্যদল ইফটা (২০০৭) ও থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম (২০১১) *মুক্তধারা* নিয়ে পরীক্ষামূলক নাট্যনির্মাণ করেছেন। উল্লেখ্য, কোনও প্রযোজনাই বিপুল ভাবে দর্শকনন্দিত হয়েছে, এমনটি বলা যায় না। শম্ভু মিত্র নাটকটি নিয়ে যারপরনাই উৎসাহী হলেও তার প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে সংশয় পোষণ করে গিয়েছেন। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা মেধা পাটকর একবার শান্তিনিকেতনে এলে তাঁর সকাশে *মুক্তধারা* অভিনয়ের আয়োজন করতে কুমার রায়ের দ্বারস্থ হয়েছিল বিশ্বভারতীর ছাত্ররা। শোনা যায়, কুমারবাবু তাদের নিরাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাটকের এমন সংকীর্ণ ব্যাখ্যা তাঁর মনঃপূত হয়নি।

এতৎসত্ত্বেও নাটক হিসেবে *মুক্তধারা*-র সমকালীনতা অগ্রাহ্য করতে পারেননি কেউই। তার প্রকরণগত সীমাবদ্ধতা, তার আপাত ভাবতরলতা সত্ত্বেও *মুক্তধারা*-কে বারংবার টুপি খুলে কুর্নিশ জানিয়েছেন সাহিত্য সমালোচক, নাট্য আলোচককুল। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত যেমন লিখেছিলেন: "মুক্তধারা রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে পারে।" নীহাররঞ্জন রায় *মুক্তধারা*-কে *রক্তকরবী*-র পংক্তিভুক্ত করেছেন। শঙ্খ ঘোষ এই প্রতিতুলনাকে আরও ব্যাপক আকারে আমাদের সামনে রেখেছেন। নিত্যপ্রিয় ঘোষ এটিকে বড় বাঁধ নির্মাণের উপযোগিতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সংশয়ের প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। পরিবেশবিদদের কাছে *মুক্তধারা*-র আদরনীয় হয়ে ওঠার পিছনে এই প্রবণতাটি কার্যকর। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

একটি সাহিত্যপত্রে শুভেন্দু দাশগুপ্ত নাটকে উপস্থাপিত উত্তরকূট ও শিবতরাই, এই দুই কল্পরাজ্যের ভিতরকার চোরা সংঘাতের বয়ানটি আমাদের সামনে রেখেছেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রটিকে মহাত্মা গান্ধীর ছাঁদে ঢালাই করে নাটকপাঠের প্রস্তাবটি আগেই খারিজ হয়ে গিয়েছে। শুভেন্দুবাবু তাঁর আলোচনায় রাজা ও প্রজার সম্পর্কের নানান স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আরও ভাবিয়ে তুলেছে প্রমথনাথ বিশীর একটি প্রাচীন উচ্চারণ। ''নাটকের মধ্যে একটি গুরুমশাই আছেন, তাঁহাকে যেমনটি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই সেই ছাঁদে উত্তরকূটের ভাবী নাগরিক গঠন করিয়া তুলিতেছেন। জনতায় যাহাদের পরিচয় পাইলাম, গুরুমহাশয়ে গোকুলে তাহারা বাড়িয়া উঠিতেছে। Totalitarian রাষ্ট্রের হাতে পড়িলে শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি সব কেমন করিয়া রাষ্ট্রনীতির অনুকূল হইয়া গড়িয়া ওঠে, গুরুমহাশয় ও বালকগণ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গুরুমহাশয় চমৎকার একটি type; তাহার দোসর আধুনিক কোনো কোনো রাষ্ট্রে সংখ্যায় প্রচুর।''

মুক্তধারার আখ্যানটি পুরোপুরি স্মরণে না রাখলেও চলবে। আপাতত এটুকু জানলেই হবে রাজার প্রত্যক্ষ মদতে যন্ত্ররাজ বিভূতি মুক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে আটকেছেন। এই উপলক্ষে মহোৎসব হচ্ছে। উত্তরভৈরব মন্দিরে যাওয়ার পথে পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হচ্ছে এই নাটকে অসংখ্য কুশীলব। উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন উত্তরকূটের এই গুরুমশাই। সঙ্গে একদল ছাত্র। তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় রাজা রণজিৎ ও মন্ত্রীর। অংশটি একবার ফিরে পড়া যাক:

গুরু। খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি। খুব গলা ছেড়ে বল, জয় রাজরাজেশ্বর।

ছাত্রগণ। জয় রাজরা—

গুরু। (হাতের কাছে দুই-একটা ছেলেকে থাবড়া মারিয়া) জেশ্বর।

ছাত্রগণ। জেশ্বর।

গুরু। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। (ঠেলা মারিয়া) পাঁচবার।

ছাত্রগণ। পাঁচবার।

গুরু। লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। বল শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। উত্তরকূটাধিপতির জয়।

ছাত্রগণ। উত্তরকূটা—

গুরু। ধিপতির

ছাত্রগণ। ধিপতির

গুরু। জয়।

ছাত্রগণ। জয়।

রণজিৎ। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

গুরু। আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন, তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল থেকেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে চাইনে।

রণজিৎ। বিভূতি কী করেছে এরা সবাই জানে তো?

ছেলেরা। (লাফাইয়া, হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।

রণজিৎ। কেন দিয়েছেন?

ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্যে।

রণজিৎ। কেন জব্দ করা?

ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক।

রণজিৎ। কেন খারাপ?

ছেলেরা। ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।

রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না?

গুরু। জানে বৈকি মহারাজ। কী রে, তোরা পড়িসনি? বইয়ে পড়িসনি? ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

ছেলেরা। হাঁ হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

গুরু। আর, ওরা আমাদের মতো— কী-বল-না— (নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা। নাক-উঁচু নয়।

গুরু। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন? নাক উঁচু থাকলে কী হয়?

ছেলেরা। খুব বড়ো জাত হয়।

গুরু। তারা কী করে? বল-না— পৃথিবীতে— বল— তারাই সকলের উপর জয়ী হয় না?

ছেলেরা। হাঁ, জয়ী হয়।

গুরু। উত্তরকূটের মানুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস?

ছেলেরা। কোনোদিনই না।

গুরু। আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগজিৎ দু শো তিরেনব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত শো দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?

ছেলেরা। হাঁ দিয়েছিলেন।

গুরু। নিশ্চয়ই জানবেন মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায় এই-সব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কত বড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি এক দণ্ডও ভুলিনে। আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কী পান আর আমরাই বা কী পাই তুলনা করে দেখবেন।

মন্ত্রী। কিন্তু, এই ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার।

গুরু। বড়ো সুন্দর বলেছেন মন্ত্রীমশাই, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার। আহা! কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড়ো দুর্মূল্য- এই দেখেন-না-কেন, গব্যঘৃত যেটা ছিল—

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

মন্ত্রী। আচ্ছা বেশ, তোমার ওই গব্যঘৃতের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরুমশায় প্রস্থান করিল

রণজিৎ। তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্য কোনো ঘৃত নেই, গব্যঘৃতই আছে।

মন্ত্রী। পঞ্চগব্যের একটা কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, এই-সব মানুষই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বলে দেওয়া গেছে দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনটি করে চলেছে। বুদ্ধি বেশি থাকলে কাজ কলের মতো চলে না।

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলো। কিন্তু সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও প্রসারিত অর্থে বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে প্রাগুক্ত অংশটির নিবিড় পাঠ আবশ্যক হয়ে পড়েছে বলে আমাদের মনে হয়। অংশটির মধ্যে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের রসায়ন নয়, অতীব তাৎপর্যপূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার মিথস্ক্রিয়া। আপাত ভাবে মনে হতে পারে, গুরু ওরফে শিক্ষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজা-মন্ত্রী ওরফে প্রধানমন্ত্রী/মুখ্যমন্ত্রী-মানবসম্পদউন্নয়নমন্ত্রী/শিক্ষা-মন্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কে প্রথম পক্ষ গ্রহীতা, দ্বিতীয় পক্ষ দাতা। দ্বিতীয় পক্ষের পৃষ্ঠপোষণা ভিন্ন প্রথম পক্ষের ক্ষুৎনিবৃত্তি অসম্ভব। আলোচনার আগামী পর্যায়ে আমরা বুঝে নেব যে এই সম্পর্ক মোটেই অসমতার শর্তে বাঁধা নেই। এখানে উভয় পক্ষই তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। রাজতন্ত্র গিয়ে গণতন্ত্র এসেছে, শিক্ষক তার অবস্থানচ্যুত হননি। অন্তত উপনিবেশবাদী ও উত্তর-উপনিবেশবাদী ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব বেড়েছে বই কমেনি। সদ্য-সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারপর্বে সরকারি ও সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকবর্গের কাছে যে ভাষায় তদানীন্তন শাসকবর্গ অনুকম্পা ভিক্ষা করেছেন, আনুগত্য দাবি করেছে, তাতে মনে হয়েছে এই মিথস্ক্রিয়া আজও কার্যকরী হলে শিক্ষক আজ অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক জায়গায় চলে গিয়েছেন। গণতন্ত্র এই বিশেষ সুবিধাটি তাকে দিয়েছে। কয়েক বছর আগে, নন্দীগ্রাম কাণ্ডের অব্যবহিত পর জয় গোস্বামী একটি কবিতা লিখেছিলেন, 'শাসকের প্রতি'। কবিতাটিতে একটি স্বৈরতান্ত্রিক রাজ্যে একজন শিল্পীর সঙ্গে শাসকের অসম সম্পর্কের নির্মমতা প্রকট হয়েছিল। শিক্ষককে এই দাসখত দিতে হয়নি। তবে শিক্ষকের প্রতি শাসকের মনোভাব *মুক্তধারা*-র আপাত রূপকথার রাজ্যে যেমন ছিল, সমকালীন ভারতবর্ষেও কতক কতক তেমন আছে। উক্তিটির বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

গুরুমশায় তার ছাত্রদের নিয়ে রাজকীয় মহোৎসবে যোগ দিতে এসেছেন। এ ঘটনা এ যুগে দুর্লভ নয়। রাজানুগ্রহ বরাবরই আকর্ষক। এই বিষয়ে সাধারণ প্রজার সঙ্গে শিক্ষকের কোনো তারতম্য নেই। রাজাকে সমীপবর্তী হতে দেখে গুরুমশায়ের বাড়তি তৎপরতা এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। মুক্তধারার রাজা সার্বভৌম অধিপতি। রাজরাজেশ্বর। ছেলেরা এই রাজরাজেশ্বর কথাটি ধার ও ভার কোনওটা সম্পর্কেই সম্যক অবহিত নয়। তাই তাদের জয়ধ্বনি যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত। তা আমাদের সমীহ আদায় করে না, হাস্যরসের উদ্রেক করে। তাতে হৃদয়ের যোগ নেই, অন্তরের আর্তি নেই। আমাদের স্কুলকলেজে যেভাবে জনগণমনঅধিনায়ক গীত হয়, কতক সে রকম। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি ভালো বুঝতেন। ছেলেদের সারল্য, তাদের নিষ্পাপ মনটি নিয়ে তাঁর মনে সংশয় নেই। সংশয় নেই গুরুর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যকলাপ নিয়ে। ফলে গুরু যতই তার রাজভক্তির প্রদর্শনে ব্যাকুল হোন না কেন, তাতে ছেলেদের স্বতঃস্ফূর্ত সায় নেই। তাদের উৎসারিত বাক্যের সঙ্গে অন্তরের কোনও যোগ নেই। তাদের রাজভক্তি থেকে রাষ্ট্রপ্রেম, সবই নিরর্থক প্রলাপের মতো শোনায়। তারা যে শিক্ষাপ্রণালীর ফসল তা বোধহীন চেতনাশূন্য এক যান্ত্রিকতার প্রবর্তক। গুরুর প্রতি তাদের আনুগত্যও প্রশ্নাতীত নয়। বিদ্যাভ্যাস তাদের কাছে অভ্যাসমাত্র। নইলে রাজরাজেশ্বরের মাহাত্ম্য অনুভব না করলেও উত্তরকূটের সঙ্গে অধিপতির সন্ধির মর্ম তারা উপলব্ধি করবে না কেন? তাদেরকে আমরা দুটি অর্থবহ শব্দ উচ্চারণ করতে শুনি— শ্রী ও জয়। মুখের সঙ্গে মস্তিষ্কের সমন্বয় না ঘটলেও এই শব্দদুটি বলে দেওয়া যায়।

ছেলেরা যে মহোৎসবের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নয়, সেটি তাদের গুরুর আগ বাড়িয়ে উত্তর দেবার প্রবণতাতেই স্পষ্ট। রণজিৎ তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? গুরু নিজের ঘাড়ে উত্তর দেবার দায় চাপিয়ে নিয়ে বলে ওঠেন, আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন, তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল থেকেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে চাইনে। এই উক্তিটির দুটি দিক আছে। প্রথমত, যন্ত্ররাজ বিভূতিকে 'আমাদের' বলে নিজেদের দলে টেনেছেন গুরু। এই প্রযুক্তিবিদ আদতে শিক্ষাব্যবস্থার সন্ততি। এই শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, রাষ্ট্রনায়কের স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ। এই দল সারস্বতচর্চার সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির কোনও ফারাক দেখে না। বিংশ, একবিংশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে রাষ্ট্র এভাবেই ব্যবহার করে। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার সবই রাষ্ট্রনীতিকে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বহন করে চলে। তার উৎপাদন, তার আবিষ্কার, তার সাফল্য, তার ব্যর্থতা, সবই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সংলগ্ন থাকে। প্রমথনাথ বিশী ইউরোপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। আজ যে কোনো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার টিকি একই ভাবে রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে বাঁধা।

গুরুর জবাবের দ্বিতীয় অংশটি আমাদের বাড়তি মনোযোগ দাবি করবে। শৈশব থেকেই দেশের জন্য গৌরব বোধ করার মধ্যে দেশপ্রেম আছে সন্দেহ নেই। এর মধ্যে একটি উগ্রদেশপ্রেমের বীজও উপ্ত হয়ে থাকছে। শিবতরাই ও তার মানুষের প্রতি ছেলেদের যে মনোভাব এই কথোপকথনের পরবর্তী ধাপে ফুটে উঠবে, তাতে নিজের দেশকে জানার চেয়ে অন্য দেশের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করা বেশি জরুরি বলে মনে হয়।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

বিভূতির অবদান কী? এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেরা লাফিয়ে উঠে বলে, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দেওয়াটাই তার অবদান। আমরা উত্তরটাকে এ ভাবে পড়তে পারি। প্রতিবেশী দুর্বলতর রাষ্ট্রকে নানা রকমে দাবিয়ে রাখা, তাদের উপর হরেক রকম শোষণ নামিয়ে আনাই উন্নততর রাষ্ট্রের শিক্ষাযন্ত্রের মৌল উদ্দেশ্য। তাদের যাবতীয় ধীশক্তি এই উদ্দেশেই ব্যয়িত হয়। এ উদ্দেশ্যেই গুরুকে ক্রমাগত আত্ম-এপর, যার আধুনিক সংস্করণ আমরা-ওরা— নির্মাণ করে যেতে হয়। গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস নির্মাণের রাষ্ট্রীক প্রয়োজনীয়তার প্রচার আমাদের উপনিবেশবাদী প্রভুদের অবদান। সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক বীক্ষার বিকৃতির সুযোগে এই অপর নির্মাণের প্রবণতা উত্তর-উপনিবেশবাদী পশ্চিমবঙ্গেও ঢুকে পড়েছে, জনমানসে তার বিস্তার ঘটেছে, এ আমাদের দুর্ভাগ্য। সংকীর্ণ অর্থে উত্তরকূট-শিবতরাইয়ের সংঘাতকে আমরা কেন্দ্র-প্রান্ত বা হ্যাভ্স-হ্যাভনটসদের সংঘাতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি, শাসক দল ও বিরোধী দলের সংঘাতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারি। খাবার জল বন্ধ করে দেবার বন্দোবস্তের সঙ্গে ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দেবার হুমকির কী আশ্চর্য মিল! হয় তুমি আমার পক্ষে, নয় তুমি সন্ত্রাসবাদী। এই অতি-সরলীকরণের পথে না হেঁটেও তথাকথিত প্রথম বিশ্বের সঙ্গে তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের সম্পর্কের অন্তরালে চলতে থাকা গূঢ় ক্ষমতার লড়াইকে সূচিত করতে থাকে উত্তরকূটের গুরুগৃহবাসী ব্রহ্মচারীদের অকপট কথন। নানান কৌশলে নানান কপটতায় দুর্বলকে বঞ্চিত রাখার যে রাজনীতি তাকেই ছেলেরা জব্দ করা বলে জানে।

শিবতরাইয়ের মানুষকে কেন জব্দ করতে হয়? ছেলেরা তো রাজনীতি বোঝে না, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বোঝে না। তাদের মগজ ধোলাই করতে অনেক বেশি কার্যকরী নীতিশাস্ত্র। গণাচার্যের কলমের এক খোঁচায় তাই তাদের খারাপ লোক বানিয়ে দেওয়া হয়। কেন খারাপ? না, তাদের ধর্ম খারাপ। ক্ষমতাবানের ধর্ম এভাবে ক্ষমতাহীনের ধর্মের মাথায় চেপে বসে। রবীন্দ্রনাথ কি আর্য ভারতের সঙ্গে প্রাকৃত ভারতের দ্বন্দ্ব মাথায় রেখে কথাগুলি লিখেছেন? তাঁর নৃতাত্ত্বিক উল্লেখ (নাক উঁচু বনাম থ্যাবড়া নাক) এই ইঙ্গিতই দেয়। ১৯২২ সালে ফ্যাসিবাদের উত্থান হয় নি, নাৎসি শিরোমণিতত্ত্ব কায়েম হয়নি। রবীন্দ্রনাথ, তবু, এই আত্ম-অপর নির্মাণের অনিবার্যতা ধরে ফেলেছিলেন। উঁচু নাকের সঙ্গে বড়ো জাত হবার সম্পর্ক জাতপাতের গোলমালে আকণ্ঠনিমজ্জিত ভারতে তখনও ছিল, এখনও আছে। তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জুড়ে দিয়েছেন যুদ্ধে জয়ী হবার সূত্র। এই ইঙ্গিতটি সরাসরি শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে না, বরং আর্য ভারত ও আর্যেতর ভারতের সংগ্রামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছে। এর সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে আর্যায়ন, শূদ্রায়ন এবং রামায়ণ। তখনও সমাজবিজ্ঞানীরা এই সম্পর্কগুলিকে এ ভাবে দেখতেন না। আমরা দেখতেই পারি। রবীন্দ্রনাথ সেই অবকাশটুকু রেখে দিয়েছেন। প্রাগ্‌জিৎ ২৯৩ জন সৈন্য নিয়ে ৩১৭৫০ জন দক্ষিণী বর্বরকে হারালেন। মানে? দ্রাবিড় সভ্যতার উপর আর্য সভ্যতার সামরিক আধিপত্য কায়েম হল। এরই সঙ্গে এল সাংস্কৃতিক আধিপত্য। এরই মধ্যবর্তী পর্বে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে দ্রাবিড়দের শিরদাঁড়া ভেঙে দেবার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছিল। আমাদের পাঠে এই ইতিহাসটিকে পুনরাবিষ্কার করলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের নতুন করে রামায়ণ পড়বার সূত্র দিলেন। শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির যোগসূত্র দৃঢ় হলো। বিজয়ী জাতির ইতিহাসের প্রামাণ্যতা স্বীকৃতি পেল। আজকাল দ্রাবিড়দের জায়গা নিয়েছেন জঙ্গলমহলের মানুষ। যন্ত্ররাজ বিভূতির স্থলাভিষিক্ত হয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। তাদের হাতে আয়ুধ— অপারেশন গ্রিনহান্ট, যৌথবাহিনী, রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইন, ইউপিএ, জমি অধিগ্রহণ আইন, খনি আইন, উপকূল নিয়ন্ত্রণ এলাকা বিজ্ঞপ্তি। *সাপ্তিক পত্রে* প্রকাশিত এই সমীকরণগুলি রচনা করেছেন শুভেন্দু দাশগুপ্ত।

কথোপকথনের শেষ পর্বটির পরতে পরতে লুকিয়ে আছে একটি বিস্ফোরক সম্ভাবনা। রাজাকে উদ্দেশ করে গুরু বলছেন, ছেলেরা বড় হয়ে যাতে শিবতড়াইয়ের বিভীষিকা হয়ে উঠতে পারে সেই লক্ষ্যেই তিনি নিজের মেধাকে, নিজের শক্তিকে চালিত করছেন। এই লক্ষ্যে তিনি যদি সিদ্ধকাম না হতে পারেন তবে তার গুরুজন্ম বৃথা। এই ছেলেদের তিনি এইভাবে লালন করতে চান যাতে তারা মন্ত্রী-অমাত্যদের হাতের পুতুল হতে পারে। উপনিবেশবাদী শিক্ষাব্যবস্থার ঊষালগ্নে শিক্ষানীতির মূলে ছিল সওদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি সরবরাহ করা। গুরুও রাষ্ট্রের স্বার্থে তদনুরূপ করছেন। স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, মৌলিক গবেষণায় উৎসাহদান এই নীতির অঙ্গ নয়। সেগুলি রাজকর্মচারীদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত।

কিন্তু এর বিনিময়মূল্য কী? *মুক্তধারা*-র গুরু বুনো রামনাথ নন। তিনি কড়ায়-গন্ডায় বুঝে নিতে চান তার আনুগত্যের তার সেবার দাম। সে কথা রাজার মুখের উপর স্পষ্টাপষ্টি বলে দিতে তার বাধে না। রাজা তাকে কিনেছেন, এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েও রাজাকে তিনি মনে করাতে পারেন তার অমিত শক্তির কথা। গব্যঘৃত এখানে বিলাসব্যসনের প্রতীক। উপরি পাওনার প্রতীক। এগুলি হাতে না এলে তিনি কি অন্তর্ঘাতের প্রচ্ছন্ন হুমকি দিচ্ছেন? তা হয়তো নয়। কিন্তু গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্য কোনো ঘৃত নেই, এই আলটপকা মন্তব্যের আড়ালে রাজার নিরাপত্তাহীনতা খুব চাপা থাকে কি? মন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, এমন গুরু রাষ্ট্রের কাজে লাগে। তারা যত নির্বোধ হন, তত মসৃণ গতিতে রাষ্ট্র তার কাজ আদায় করে নেয়।

তবু কোথাও কোথাও এক আধজন উদয়ন পণ্ডিত থাকেন। শিক্ষক ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক নির্ভরতার চিরাচরিত মডেলকে তাঁরা ছুঁড়ে ফেলে দেন। তাদের অপেক্ষাতেই রবীন্দ্রনাথ থাকেন, সত্যজিৎ রায় থাকেন। থাকেন আরও কেউ কেউ। শিক্ষক তখন প্রস্তাবে রাজকর্মচারী থাকেন না, আক্ষরিক অর্থে গুরু হয়ে ওঠেন।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

চার অধ্যায়-এর পঞ্চমাংক বা মধ্যভূমির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি

জয়ন্ত দাস

কোনো এক শনিবারের সন্ধ্যায় তপন থিয়েটারে চার অধ্যায় নাটকটি দেখলাম। নাটক-ব্যাপারে আমার টেকনিক্যাল সমালোচনার কোনো অধিকার নেই, কিন্তু দেখতে দেখতেই আমার মনে হচ্ছিল কিছু একটা বলা দরকার।

এই যে নাটকটা হচ্ছে সেটা তো আর হাওয়ায় হচ্ছে না। এর একটা পরিপ্রেক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের দেড়শ বছর পূর্ণ হচ্ছে। দেশ জুড়ে ধুম লেগেছে রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আবিষ্কার করার। এ-নাটক তার-ই এক অংশ। আর এ-নাটক শুধু সেটুকু, সেটুকুই মাত্র, এমন ভাবলে ভুল হবে। রবি ঠাকুরের উপন্যাস 'চার অধ্যায়' তারই নাট্যরূপ দেয়া হয়েছে। রবি ঠাকুরের উপন্যাসটি সেসময়েই যথেষ্ট বিতর্কিত ছিল। কেননা বাংলার ১৩৪১ সাল, অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩৪ কি ১৯৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত এই উপন্যাসের পটভূমি ছিল বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, যাকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও বলা হত। এখন সেই উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দেওয়া, তার একটা মানে আছে, এবং নাট্যদলটি সে মানেটিকে কখনও গোপন করার চেষ্টাও করে নি।

গৌড়চন্দ্রিকা ছেড়ে আসল কথায় আসা যাক। নাটক। নাটকটি উপস্থাপনা করেছেন টোটাল থিয়েটার। নাট্যরূপ দিয়েছেন শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা শান্তনুর, ইন্দ্রনাথের ভূমিকাতেও শান্তনু। পল্লব কীর্তনিয়া খুব ভাল অভিনয় করেছেন, তার ভূমিকা অতীনের। অতীন হল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী দলের এক অসাধারণ গুণী সদস্য, যে এতোদিন দলের সবকিছু মেনে মেনে আজ মানবিকতার তাগিদে দলতন্ত্র আর মানতে পারছে না। এছাড়া মূল চরিত্র হল এলা, যে অতীনের প্রেমিকা, ও নেতা ইন্দ্রনাথের হাতে গড়া সন্ত্রাসবাদীদের প্রেরণা এবং ইন্দ্রনাথ, বিংশ শতকের গোড়ায় বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, যাকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও বলা হত, তারই প্রধান নেতা। এলা বিপ্লবীর প্রেরণা, কিন্তু নিজে প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কাজকর্মে নেই, অন্তত নাটক দেখলে সেরকমই মনে হয়। তার হাতের ফোঁটা 'ছেলেদের' মনে যে কি আগুন জ্বালিয়ে দেয়। খটকা লাগে, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর একশ বছর পূর্ণ হচ্ছে তো এই ২০১১তেই, রবি ঠাকুরের চেয়ে পঞ্চাশ বছরে ছোটো সেই প্রীতিলতা চট্টগ্রামে ইউরোপীয়ান ক্লাব অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উপন্যাস প্রকাশের দু-তিন বছর আগে। কল্পনা দত্ত, পরে কল্পনা যোশি, প্রীতিলতার চাইতে একটু ছোটো, তিনিও রীতিমত বোমা গুলি ছুঁড়ে হাত পাকা করেছেন, অলংকার হয়ে বসে ফোঁটা কাটার ভূমিকা তাঁরও নয়। বীণা দাস ১৯৩২ সালে বাংলার ছোটলাট স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করে মারতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল খাটছেন। আর রবিবাবুর ১৯৩৪-৩৫ সালে লেখা উপন্যাসে এলা, এলালতা, স্রেফ 'ছেলেদের' মনে 'আগুন জ্বালিয়ে দেয় ফোঁটা কেটে', আর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রধান নেতা ইন্দ্রনাথ তাকে সে কাজই দিয়েছেন। এ কি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে নেহাত পরিচয়ের অভাব, নাকি কাহিনীর প্রয়োজনে একটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের চরিত্র নিজের মত করে বানিয়ে তোলা?

অতীন ও এলার প্রেম চলতে থাকে স্টেজে, তাতে প্রেমের কথার চাইতে প্রায়ই বড় হয়ে ওঠে তাদের বিপ্লবী আন্দোলনের কথা, বা বলা ভাল সে আন্দোলনের ব্যর্থতার কথা, সে আন্দোলনের চোরাবালিতে ক্রমে ডুবে যাবার কথা। অতীন বলে, কেমন করে আস্তে আস্তে এই আন্দোলনের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে নেতার কথামাফিক একটা শক্ত লম্বা দড়ি ধরে টেনে যাওয়া, স্বাভাবিক মানুষের ধর্ম ভুলে যাওয়া, রাষ্ট্রকে হারাতে গিয়ে নিজেরাই এক পাল্টা-রাষ্ট্র হয়ে ওঠা, হিংস্র যন্ত্রের সামনে যন্ত্র হবার সাধনায় মেতে থাকা। আর এই করতে করতে কেমন করে সব অসাধারণ ভাল ছেলের দল দিনের পর দিন কি কষ্টই না সয়েছে, মরেছে তারা, মেরেছেও। আর সবচেয়ে বড় লোকসান হল এই যে এমনি করে আস্তে আস্তে এদেরও মধ্যে প্রবেশ করল অমানুষ হবার লক্ষণ। দেশোদ্ধারের উপকরণ শেষে পরিণতি পেল নিজেদের মধ্যে সন্দেহ আর হিংসায়।

অতীন বলে, এলা বলে, এলা-রা বলে, কেননা এলার ভূমিকায় তিনজন অভিনেত্রী অভিনয় করছিলেন, তিনজন সংলাপ বলছিলেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারা বলে কেমন সব লোক ঢুকে গেছে দলে, তারা এতোদূর খারাপ যে এলাকে একজন এও বলেছে পুলিশ এলাকে ধরবে, আর সে এলাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে, পারে অবশ্য যদি এলা তাকে বিয়ে করে। অতীন বলে যাদের এলা একদিন দিয়েছে ভাইফোঁটা তারাই এখন শলা করছে এলার বাঁচার অধিকার নেই, সে বড় বেশি জেনে ফেলেছে। বাস্তবের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস— এদের বোধকরি আজকের এই কঠিন সময়ে মনে না রাখলেও চলবে, রবিবাবুর এলারাণীকে মনে রাখা খুব জরুরি, যাঁরা চার অধ্যায় নাটকটি রূপায়িত করেছেন তাঁরা নাটকের পরে বলবেন। আমরা শুনব।

নাটকের ক্লাইম্যাক্সে অতীন মৃত্যু আসন্ন জেনেও নিজের প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে পারে না। তখন তার কর্মফল তাকে জড়িয়ে ধরেছে, একার নিষ্কৃতির উপায়ের সাধনা করে সে নিজেকে ছোট করতে পার না। অতীন বোধকরি মরার দিকে যায়, এলাও বাঁচে কিনা ঠিক বোঝা যায় না।

চার অধ্যায় কেন বাছলেন নাট্যদলেরর লোকেরা? এখনি কেন দরকার পড়ল এটির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করার? নাটকের শেষে তার জবাব তাঁরা নিজেই দিয়েছেন, তবে তার বড় বেশি প্রয়োজন ছিল এমন নয়। নাটক চলতে চলতেই হলশুদ্ধ লোক দিব্যি বুঝতে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

পারছিল কারা আজকের সন্ত্রাসবাদী কারা আজকের ইন্দ্রনাথ। আর সন্ত্রাসবাদী ইন্দ্রনাথ যখন আছে তখন অতীন— এলাও আছে নিশ্চই সংগঠনে কোথাও, মরছে তারা এভাবেই। মাওবাদী, মাওবাদীরাই আজকের সন্ত্রাসবাদী, আজকের ইন্দ্রনাথ। যদিও কখনও বোঝা যায়নি তারা কেন লড়ছে, কাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই। আর বোঝা যায়নি জনগণ কি করছিল তখন; এমনকি জনগণ আছে কোথাও এমন সন্দেহটাই মনে আসে নি নাটক দেখতে দেখতে।

রবিঠাকুর কেন চার অধ্যায় উপন্যাস লিখেছিলেন সে প্রশ্নে পরে আসা যাবে। আপাতত প্রশ্ন এই, মাওবাদীদের চার অধ্যায় নাটকের চাঁদমারি করার যুক্তিটা কি? ইন্দ্রনাথ তথা অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কাছে অনেকগুলো বিকল্প ছিল। কংগ্রেস করা যেত, অথবা হিন্দু মহাসভা, বা মুসলিম লিগ বা ফরয়ার্ড ব্লক বা নেহেরু বা চিত্তরঞ্জনের দল ইত্যাদি নানা কিছু তাঁরা করতেই পারতেন। করে কতটা কাজ হত সে প্রশ্ন আলাদা, কথাটা এটাই যে সেই পরাধীন ভারতে অন্তত একটা পরিসর ছিল, একটা বিকল্প ভূমি ছিল রাষ্ট্রশক্তি আর সশস্ত্র বিপ্লবীদের মাঝামাঝি। সে ভূমিটা রাষ্ট্র দিত, শুধু দিত নয় তাকে এনকারেজ করত, জনগণের বিক্ষোভের সেফটি ভাল্বের প্রয়োজনে করলেও করত তো।

তা এখন মাওবাদী কারা, আর তাদের সামনে বিকল্পগুলোই বা কি খোলা আছে? একথা বোকাতেও বোঝে (যদিও মতলববাজেরা বোঝে না কিছুতেই) যে জনজাতি অধ্যুষিত একটি জঙ্গল এলাকতে বাইরে থেকে তত্ত্ববিদ 'ক্যাডার' এনে বছরের পর বছর পুলিশ এলাকায় চিরুনী-তল্লাসী চালাচ্ছে, যাকে তাকে মারছে ধরছে। পুলিশ মানে আমি মিলিটারি প্যারা-মিলিটারি ইত্যাদি রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে থাকা সব ধরনের সশস্ত্র ফোর্স-এর কথা বলছি।

স্কুলটুল বন্ধ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ, উন্নয়নের কাজ বন্ধ। সরকার বলছে, মাওবাদীরা করতে দিচ্ছে না। ঠিক, তবে এতোদিনে মনে পড়ল এই মানুষগুলোরও কাজ লাগে, অন্ন লাগে, পিপাসার জল লাগে? মাওবাদীরা স্বাধীন ভারতে পঞ্চাশ বছর ধরে ছিলনা তো। ততদিন মনে পড়ে নি? মাওবাদীরা এসে যাবার জন্যেই মনে পড়ে গেল, এমন যদি ভাবেই এতোদিন প্রান্তে পরে থাকা জনজাতির এই মানুষজন, আর সে ভেবে যদি মাওবাদীদের উপস্থিতিকে আপনাদের আজ তাদের কথা ভাবার কারণ বলে ধরে নেয়, তাদের দোষ দেওয়া যায় কি? মাওবাদীদের পদ্ধতিটি, আবার বলছি, আমি সমর্থন করছি না কিন্তু। শুধু জিজ্ঞাসা করছি, ভারতরাষ্ট্রের কার্যকলাপই কি জনজাতির মানুষজনদের তাদের হাতে, তাদের পথে পাঠিয়ে দিচ্ছে না?

বেঁচে থাকার জন্য জনজাতির মানুষজন এতদিন যা করছিলেন সেগুলো বন্ধ, বা প্রায় বন্ধ করে দিচ্ছে। হয় তোমার জঙ্গলে ঢোকার আইনী অধিকার নেই, নয় পুলিশ মারবে বলে কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না, বা তোমার আনা জিনিস বেচতে যাবার উপায় নেই।

পুলিশ আটকাচ্ছে, আবার কোথাও কোথাও মাওবাদীরাই আটকে দিচ্ছে গতিবিধি। তুমি পুলিশে খবর দেবে কিনা কে জানে। হ্যাঁ, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো পাল্টা এক রাষ্ট্রযন্ত্রের মত। তফাত হল, তুমি চাইলে এ-যন্ত্রে যোগ দিতে পারো। ক্ষমতার বিরুদ্ধে পাল্টা ক্ষমতা হয়ে উঠতে পারো। সে কাজটা ভালো কি মন্দ তা অবান্তর প্রশ্ন হয়ে উঠছে। রাষ্ট্র নিজেই সেটাকে অবান্তর করে দিচ্ছে।

বছর ভর 'এলাকার দখল' করে রাখা যায়না, বিশেষ করে যখন ভারত রাষ্ট্রটি যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে তারই নিজের 'নাগরিক'দের বিরুদ্ধে, এতটাই মরিয়া সে যে আকাশ থেকে হেলিকপ্টারে করে নিজের দেশে নিজের মানুষের ওপরে বোমা ফেলার ব্যাপারে খুব গভীর আলোচনা চলে মন্ত্রীদের মধ্যে। তাই অধিকাংশ 'মাওবাদী' হলেন এই মুহূর্তে জঙ্গলমহলে কোনমতে বেঁচে থাকা জনজাতির মানুষজন। তাঁদের প্রাথমিক দীক্ষা যে বহিরাগত তত্ত্ববিদ 'ক্যাডার'রাই দিয়েছেন সে ব্যাপারটি অবশ্য সন্দেহ করা চলে না এবং না, আমি জনজাতির মানুষজন নিজেরা চালাচ্ছেন অতএব পদ্ধতিটি সঠিক, এমন অতি-সরলীকরণও করছি না মোটেই। খালি বলছি, বিংশ শতকের গোড়ায় ব্রিটিশ ভারতে যে সশস্ত্র আন্দোলন হয়েছিল তার চেয়ে এ-আন্দোলন চরিত্রে আলাদা, একেবারে মূলগতভাবেই আলাদা। 'চার অধ্যায়'-কে এই আন্দোলনের পটভূমিকায় বসিয়ে দেওয়া মানে চার অধ্যায়ে পঞ্চমাঙ্ক যোগ করা, এবং স্রেফ গায়ের জোরে যোগ করা।

আবার বলছি, মাওবাদী বাহিনী মানে এই মুহূর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জঙ্গলমহলে কোনোমতে বেঁচে থাকা জনজাতির মানুষজন। তাই চার অধ্যায়-এর মধ্যবিত্ত নাগরিক সন্ত্রাসবাদীদের যে পথ বেছে নেবার স্বাধীনতা ছিল এঁদের তা ছিল না। নেই।

কি হয়েছে, কি কি হচ্ছে জঙ্গলমহলে?

সরকার বলছেন এতদিনের বাসভূমি ছেড়ে চলে যাও।

শহরে দাঁড়িয়ে নিরাপদ তুমি ভাবতে পারো মাওবাদীদের বিপক্ষে তুমি। এবং তুমি ভারতরাষ্ট্রের আক্রমণেরও বিপক্ষে। তুমি ভাবতেই পারো 'ওখানে' গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আন্দোলনকেই কেবল সমর্থন করবে। নাগরিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন। স্বাস্থ্যের জন্য বা শিক্ষার জন্য আন্দোলন। জীবিকার দাবীতে আন্দোলন। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রযন্ত্র, চুপটি করে হাসতে থাকে। তার মুখটা কখনো সোনিয়ার মত, কখনো মনমোহনের মত, কখনো রুনু গুহনিয়োগীর, কখনো বুদ্ধের, কখনো চিদাম্বরমের; শ্ব-দন্তটি খালি নিঃশব্দে দেখা দিচ্ছে ও তোমার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধটি রাষ্ট্রের ব্যাদিত বদনে প্রবেশ করছে।

বিনায়ক যখন কোনরকম প্রমাণ ছাড়াই গ্রেপ্তার হয়ে যান তখন তুমি মিছিল কর। রাষ্ট্র আরামে ঘুমোয়। বিনায়ককে কারাদন্ড দেয়। তুমি আরো জোরে চেঁচিয়ে বল এ অন্যায়। রাষ্ট্র শুনতে পায় না।

তা বলে সে যে তোমার কোন কথাই শুনতে পায় না, শোনে না, তা কিন্তু নয়। তুমি মাওবাদীদের প্রত্যাখান করে কথা বল, নাটক কর, রাষ্ট্র ঠিক শুনতে পাবে।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ঠিক যেমন আমি এই লেখায় করেছি, তেমনি করে তুমিও প্রতিটি লেখায় দুলাইন অন্তর লিখে জানাও, তুমি তাই বলে মাওবাদীদের সমর্থন কর না। তোমাকে লিখতে হয়, লিখতেই হয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রতো, তাই।

কথায়, গানে, নাটকে, লেখায়, রাস্তায় তুমি তোমার কথা বল। কৌশিক সেন নাটক করলেন 'বীরপুরুষ'। বললেন রাষ্ট্র যেমন জনজাতির মানুষের ওপর জুলুম করছে, মাওবাদীরাও তাই করছে। রাষ্ট্র যেমন করে সালওয়া জুদুম তৈরি করেছে গায়ের জোরে। অন্য কিছু তুমি ওখানে ওই জঙ্গলমহলে বসে করতে পারো না, পারোই না। তুমি অনশন-ধর্মঘট করতে পারো না। অনশন তো এমনিতেই করেছ এতদিন, রাষ্ট্র জানতেই পারেনি, সিভিল সোসাইটি দেখতেই পায়নি, টেলিভিশনে প্রচারিত হয়নি। ধর্নায় বসতে পরোনা, পুলিশ মেরে তাড়িয়ে দেবে, কেউ কিচ্ছুটি জানতেই পারবে না, আর তোমার এলাকায় না আছে রাইটার্স না আছে বি ডি ও অফিস, এসপ্লানেড ইস্ট-তো তোমার স্বপ্নেও আসেনা।

নিজেদের উন্নতি নিজেরা করবে? বাঃ, তোমরা তো দেখছি মহা তালেবর হয়ে উঠছ দিন কে দিন। আরে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবেনা তাহলে? বোঝো বাবাসকল, একটু বুঝতে চেষ্টা কর, ঐ যে গান্ধীবাদী হিমাংশু কুমারের বনবাসী চেতনা আশ্রম ভেঙ্গে দিলাম, ঐ যে ডাক্তার বিনায়ক সেনকে গ্রেপ্তার করলাম, ওরা তো ঐটাই করতে চাইছিল। নিজেরা এসে কিছু দান-দক্ষিণা খয়রাতি করে টাটা সুমো চেপে সন্ধেবেলা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেত, আমরা চোখ মেলে দেখতামই না। কিন্তু বনে-জঙ্গলে ওদের সঙ্গে থেকে ওদের তো আমাদের নাগরিকদের মত করে তুলতে চাইছিল এনারা। তাহলে আবার সেই এক মুস্কিলে পড়তে হত আমাদের। মধ্যভূমি তৈরি হয়ে যেত। মাওবাদী আর পুলিশের মধ্যে তৈরি হত এক পরিসর।

আমরা, ভারতরাষ্ট্র, রাষ্ট্রের মালিকরা, ওই মধ্যভূমি চাই না। বধ্যভূমি চাই অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে। ছত্তিশগড়ে বা লালগড়ে। মনিপুরে বা কাশ্মীরে। হয় তুমি আমাদের দলে, সালওয়া জুদুম। নয় তুমি ওদের দলে, মাওবাদী বা ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী।

হয় তুমি আমাদের দলে, ইসরায়েল বা ইন্ডিয়া। নয় তুমি ওদের দলে, আল-কায়দা বা ... ওহ্, ভুলে গেছিলাম, কথার ঝোঁকে ভুলেই গেছিলাম সম্পাদক আমাকে এতটা স্বাধীনতা দেননি, থুড়ি।

জোরে, মাওবাদীরাও সেভাবে তাদের বাহিনী রিক্রুট করছে। রাষ্ট্র শুনেছে কিন্তু। অবশ্য তার নিজস্ব শুনতে-চাওয়া বয়ানে শুনেছে। কেমন শোনা সেটা?

রাষ্ট্র তোমার কাছ থেকে সম্মতি আদায় করে নেয়, শান্তির সম্মতি। শান্তির একছত্র রক্ষক হয়ে ওঠার সম্মতি। শান্তিভঙ্গকারীদের শাস্তি দেবার সম্মতি। সিভিল সোসাইটি একমত হয় মাওবাদীদের পথটা ভুল, কেন যে ভুল তা নিয়ে সূক্ষ্ম বাদানুবাদ চলে। মাওবাদীরা কারা সেটা নিয়ে সিভিল সোসাইটি অনেক কথা বলে। ব'লে ভাবে বিষয়টা পরিষ্কার করছে, বুঝিয়ে দিচ্ছে সকলকে। রাষ্ট্র ও বড় মিডিয়া কিন্তু তালে থাকে, তোমার কথা থেকে নিজস্ব সারমর্ম উদ্ধার করার, সেই সারমর্মকে ছড়িয়ে দেবার তাল।

তুমি মাওবাদীদের নিয়ে নাটক কর। সাংস্কৃতিক কাজকর্মে আন্দোলনে তাদের কথা বল। তোমাদের কথাগুলো নিয়েই যেন, তোমাদের কথার প্রায় প্রতিধ্বনি করেই প্রায়, রাষ্ট্র ও বড় মিডিয়া বলে মাওবাদীদের কেউ সমর্থন করছে না। কিন্তু বলে না সমর্থন করছে না তার কারণ হল মাওবাদীরাও রাষ্ট্রের মত আচরণ করছে।

তোমার এ-কথাটাও হারিয়ে যায় যে তুমি মাওবাদী-হয়ে-ওঠা, হয়ে-উঠতে-থাকা জনজাতির মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলছ। তোমার কথার যে আওয়াজটা শেষ পর্যন্ত মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছয় তা হল তুমি মাওবাদীদের বিরুদ্ধে। চিদাম্বরম যেমন বিরুদ্ধে তেমন, বা প্রায় তেমনই। সুতরাং মাওবাদীদের বিরুদ্ধে 'আইনী' ব্যবস্থায় তোমার সায় আছে। তুমি যে আদতে ভূমিপুত্রদের মাওবাদী দলের লোক বলেই মনে কর না, তাদের তুমি বাঁচাতে চাও রাষ্ট্র ও মাওবাদীদের যুগপৎ আক্রমণ থেকে, সেটা তুমি ছাড়া আর কেউ বিশেষ বুঝতেই পারে না। রাষ্ট্রের আসল কাজটাতে চাও-না-চাও তুমিও শরিক হয়ে ওঠো। আসল কাজ? জঙ্গলমহলের জমি থেকে সব্বাইকে তাড়িয়ে খনি বানানো। বৃহৎ পুঁজির হাতে সেটা তুলে দেওয়া।

চার অধ্যায়-এ ফিরি। নাটকের শেষে স্টেজে উঠে নাট্যকার অভিনেতা কলাকুশলী সহযোগী সবাই মিলে দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, নাট্যকার বা প্রযোজক কে যেন একজন জানালেন চার অধ্যায় তাঁরা মঞ্চস্থ করেছেন কেননা আজকের সময়ে এই উপন্যাসের এই নাটকের এক অন্য দ্যোতনা আছে, আজ বাঙ্গলায় তথা ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে চার অধ্যায় নতুন করে পড়তে হবে বুঝতে হবে। না, মাওবাদীদের কথা বলেননি তাঁরা, অন্তত যতটা জোরে বললে হলের লোকে শুনতে পেত ততটা জোরে বলেননি।

বলার কোনো দরকারও ছিল না।

ঠিক কোনভাবে আমরা মাওবাদীদের মূল্যায়ন করব? রাষ্ট্র চায়, রাষ্ট্র যেভাবে করেছে সেভাবেই। 'বহিরাগত' সন্ত্রাসবাদী হিসেবে। আমরা জানি, সত্যি কথাটা হল অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাওবাদী মানে এই মুহূর্তে জঙ্গলমহলে কোনোমতে বেঁচে থাকা জনজাতির মানুষজন, যাঁরা নেহাত অনেক সময়ে পরিস্থিতির চাপে অস্ত্র ধরেছেন। তবু, তবুও আমরাও কি পাকে-প্রকারে রাষ্ট্রের গলায় গলা মেলাব? কথায়, গানে, নাটকে, লেখায়, রাস্তায়? মাওবাদীদের সমর্থন এ-লেখার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে আমাদের একটা দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে তো? নাকি আমরা রাষ্ট্রের হাতেই ছেড়ে দেব সেই দৃষ্টি তৈরি করার অধিকার?

মধ্যভূমি বিলোপের প্রচেষ্টায় আমরাও সামিল হব, হয়ে পড়ব নাকি শেষ অবধি।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

বিতর্ক

পরিবর্তনের সাত কাহন

শঙ্কর মিত্র

'অনীক'-এর 'পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন' (জানু-ফেব্রু '১১) সংখ্যায় প্রকাশিত পূর্ণেন্দু বসুর নিবন্ধ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন শঙ্কর মিত্র। তাঁর প্রতিবাদপত্র এবং মূল লেখকের বক্তব্য প্রকাশ করা হলো।

তৃণমূল কংগ্রেসের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা হওয়ার সুবাদে পূর্ণেন্দু বসু তাঁর লেখায় এই জটিল সন্ধিক্ষণে অধঃপতিত ও ক্ষয়িষ্ণু বামফ্রন্টের অবিসংবাদিত বিকল্প হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেসকেই তুলে ধরেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের সাথে জোটবদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেস আসলে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের ইউপিএ(২)-এর রাজ্য সংস্করণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যাঁদের শাসন নিয়ে এসেছে আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি আর যাঁরা দেশের সমস্ত সম্পদ তুলে দিচ্ছে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে। হাজার হাজার কৃষক যখন ঋণের দায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে, তখন এই ইউপিএ(২) সরকার পুঁজিপতিদের জন্য প্রতিদিন ২৪০ কোটি টাকা কর মকুব করে যাচ্ছে। দেশ জুড়ে লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি চললে এঁরা নজরদারির জন্য বেছে নেন এমন এক ব্যক্তিকে, যিনি নিজেই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। আবার, পান থেকে চুন খসলেও তুলকালাম করতে অভ্যস্ত এই সমস্ত সততার প্রতীক তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা কিন্তু জোটের মধ্যকার এই পর্বত-প্রমাণ দুর্নীতি নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা উদ্বিগ্ন বলে মনে হয় না। বিস্তীর্ণ আদিবাসী এলাকায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন হতে থাকলে নেমে আসে 'অপারেশন গ্রিন হান্ট, রাজদ্রোহের অভিযোগে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এ প্রসঙ্গে তৃণমূলী দাওয়াই হলো পশ্চিমবঙ্গের মাওবাদী এলাকাগুলি সরাসরি সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি বা কাশ্মীরের জনগণের অভিজ্ঞতা তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে ধর্তব্যের মধ্যেই নেই। বিকল্পের দাবিদার শ্রীবসুর লেখায় এসমস্ত প্রশ্ন নিয়ে কোন সদুত্তর নেই। বিপরীতে, এসব বিষয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করাকেই তিনি অবান্তর মনে করছেন। আমরা শিখেছি ভুরু কোঁচকালেই বুদ্ধি বাড়ে। অথচ শ্রীবসু কারোর কপালে ভাঁজ পড়লেই বিরক্ত বোধ করেন।

এটা ঠিক, অধঃপতিত সিপিএম বা তাঁদের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনায় বা ধিক্কারে শ্রীবসুর বক্তব্যের অনেকটাই যথাযথ। তবু তার পাশাপাশি রাজ্যে বিকল্প সম্পর্কে তাঁর যে বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করেছেন তা গলা দিয়ে নামানো বেশ কঠিন। 'যা হবার হবে' এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততার উদ্বাহু পূজা সবাই না-ও করতে পারেন। এতে শ্রীবসু যারপরনাই উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রবল উষ্মা প্রকাশ করেছেন বিপ্লববাদীদের প্রতি, বিশেষত বিপ্লবী বামপন্থীদের প্রতি, যাঁরা অধঃপতিত বামপন্থার বিপরীতে বিকল্প জনমুখী বামপন্থার কথা বলে থাকেন, নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা চালান। এখানেই শ্রীবসু বেশি খড়্গহস্ত। প্রচ্ছন্নভাবে তিনি তাঁদের সাধ ও সাধ্যের মধ্যকার দুস্তর ফারাককে দেখিয়ে দিয়েছেন, আর সেই কারণেই তিনি বিপ্লবী বামপন্থীদের ডান-বামের তোয়াক্কা না করে বা অযথা বাছ-বিচার না করে এবং অগ্রপশ্চাৎ ভাবনা-চিন্তা না করে শ্রীবসুরই মতো তৃণমূল শিবিরে নাম লেখাতে বলেছেন। শ্রীবসুকে মনে করিয়ে না দিলেই নয় যে, ঠিক এই কারণেই, অর্থাৎ সাধ ও সাধ্যের ফারাক দূর করতেই বামপন্থী শক্তি চিরকালই একপ্রস্থ রণনীতি ও রণকৌশল প্রণয়ন করে তাঁদের যাত্রা শুরু করেন এবং শাসকদের বিকল্প হয়ে ওঠার লক্ষ্যে শক্তির ভারসাম্যের বদল ঘটাবার প্রক্রিয়ায় স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের সামঞ্জস্যবিধান করতে গিয়ে কখনোই নিজেদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যকে ও মতাদর্শকে, নিজেদের স্বাধীনতা ও উদ্যোগকে এক মুহূর্তের জন্যও বিসর্জন দেন না। বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প হয়ে ওঠার পথে নিশ্চয় অনেক পর্যায় পার হতে হবে, কিন্তু কোনো পর্যায়তেই নিজেদের স্বাধীনতা ও উদ্যোগ বিসর্জন দিয়ে চিহ্নিত দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে সুবিধাবাদী মোর্চা বানিয়ে মিশে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের সাথে তথাকথিক মিশে যাওয়ার বা জনগণকে পক্ষে আনার চালাকি করতে গিয়ে তাঁদের চেতনাকেই সংশোধনের অতীত দূষিত না করা হয়, যা শেষ বিচারে বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ার উদ্দেশ্যেকেই ব্যর্থ করে দিতে পারে, বিপ্লবী বামপন্থীদের অবস্থান এরূপ। তৃণমূল কংগ্রেসের উৎপত্তি ও বিকাশের প্রক্রিয়া ব্যাপক জনগণ সম্পূর্ণই বিস্মৃত হয়েছে, এমনটা নয়। ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের উত্থানের প্রক্রিয়ায় সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ-সুব্রত ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে নব কংগ্রেস, যুব-কংগ্রেস প্রভৃতি সাইনবোর্ডের আড়ালে যে উগ্র জনবিরোধী তথা বাম-বিরোধী শক্তি জোটবদ্ধ হয়েছিল, যারা জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো বর্ষীয়ান নেতাকে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে মিটিং করতে না দিয়ে তাঁর গাড়ির বনেটের উপরে উঠে নর্তন-কুর্দন করেছিল, তাঁদেরই উত্তরসূরী যে তৃণমূল কংগ্রেস, যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'লাল হটাও', 'বাম হটাও' শ্লোগান মুখে নিয়ে জন্মেছিল, তা চাপা দেওয়া হলেও মুছে ফেলা যাবে না। অধঃপতিত সিপিএম তথা বামফ্রন্টের অপকর্মগুলি বিরোধিতার নামে, গ্রাম-শহরে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে সামন্ত অবশেষের বিরুদ্ধে গরিব কৃষক ও গ্রামীণ গরিবদের যে কোন দাবি-দাওয়া বা অধিকারের আন্দোলন সংগ্রামকে 'লাল সন্ত্রাস' বলে নিন্দা করে ও গ্রামীণ সম্পত্তিবানদের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁদের জমি-সম্পত্তি রক্ষা করতে এগিয়ে যাওয়াই ছিল যাদের কাজ। নিজেদের কংগ্রেসি ঘরানার শরিক বলে দাবি করে ইন্দিরা-রাজীবের আশীর্বাদধন্য হিসাবে কেন্দ্রীয় জাতীয় কংগ্রেসের বৃহৎ পুঁজিপতি-বৃহৎ জমিদারদের রাজনীতিতে তাঁদের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার বলে দাবি করতো আর কংগ্রেসিদের বলতো 'তরমুজ'। সাম্রাজ্যবাদের

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

অনুচরদের মতো ছিল তাঁদের উগ্র কমিউনিস্ট বিদ্বেষ। পরে কিছু ধুরন্ধর আমলা ও দলত্যাগীদের পরামর্শে তাঁরা ভোল পাল্টেছে আর 'সন্তসুলভ' উদারতা ও প্রসারতার আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে এখন ব্যাপক গণতান্ত্রিক ঐক্যের রূপকার সাজতে চাইছেন আর পূর্ণেন্দু বসুর মতো কলমচিরা তাঁদের পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রাণমনে তাঁবেদারি করে চলেছেন।

শ্রীবসুর মূল দাবি সিপিএমের দলতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে তৃণমূল কংগ্রেস। সেজন্যই তাঁরা সমর্থনীয়।

পার্টি একটা হাতিয়ার। যে কাজের জন্য, যেভাবে তা নির্মিত হবে, সে তাই করবে। কারো মনোগত বাসনা পূরণ করবে না। তৃণমূল কংগ্রেস দলটি দেখে কি কারোর মনে হয়, দলটি নিজে খুব গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত ও পরিচালিত এবং এর দ্বারা ব্যাপক জনগণের গণতন্ত্র ও নাগরিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে? নাকি মনে হয়, পার্টিটি কার্যত এক-নায়কত্বের বা এক-নায়িকাতন্ত্রের পার্টি হয়ে আছে। পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বা রীতিনীতি সম্পর্কে উৎসাহজনক কিছুমাত্র দেখা বা বোঝা যায় না। এ হেন একটি দল নিয়ে শ্রীবসু যে দলতন্ত্র বা দলদাসত্ব ঘোচাতে চাইছেন, তা কতখানি যুক্তিযুক্ত বা বাস্তবসম্মত?

কেন্দ্রের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের কর্মসূচি বিশ্বস্তভাবে এরাজ্যে নামাতে গিয়ে সিপিএম নিজেকে পুরোপুরি একটি বৃহৎ বুর্জোয়াদের পার্টিতে পরিণত করেছে, যদিও তার গণভিত্তি অন্যত্র। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী তৃণমূলও যে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা-ও তো লক্ষ্য করার মতো। রাজ্যের পূর্বতন কুখ্যাত জনবিরোধী সরকারি আমলা, যিনি নিজেই আবার দেশের এক বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর উচ্চপদস্থ আমলা (টাটা মেটালিক্সের ডিরেক্টর-মণীশ গুপ্ত দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিগোষ্ঠীর স্বার্থের তল্পিবাহক বণিক সভার (FICCI-র) সভাপতি অমিত মিত্র তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছে। তৃণমূল যেন বিদেশের মতো পুঁজিপতিশ্রেণীর নিজস্ব পার্টিতে পরিণত হচ্ছে, যেখানে পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিরা নয়, পুঁজিপতিরা নিজেরাই নেতাগিরি করে। এমন শোষক শ্রেণীর এক পার্টি রাজ্যের সাধারণ মানুষের কোন্ কাজে লাগবে, তারা বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণি বা বিদেশি পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ দেখবে, না রাজ্যের মেহনতি মানুষের স্বার্থ দেখবে? বৃহৎ পুঁজির সেবাদাসে পরিণত সিপিএম থেকে তারা কোন্দিকে কীভাবে পরিবর্তন আনবেন, তা জানার অধিকার রাজ্যের মানুষের আছে। তৃণমূলের অন্যতম শ্রমিকনেতা ও প্রবক্তা এ সম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রেয় বোধ করেছেন।

শেষ করার আগে আরেকটু বলতে চাই। সিপিএম ও তৃণমূল দুই-ই শাসকশ্রেণীগুলির পার্টি হয়ে আছে, রাজ্যে এইভাবে এক মেরুকরণ হয়েছে। এর বাইরে কোন তৃতীয় শক্তি বা বাম শক্তির দুর্বলতার কারণে এখানে গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত হয়ে আছে। দ্বিমেরুকরণকে সংহত করা হচ্ছে, শ্রীবসু তারই ওকালতি হাতে নিয়েছেন। আর এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়া বিপ্লবী বামপন্থীদের কাছে এক বড়ো চ্যালেঞ্জ।

একই পথের দুই শাখার মধ্যে প্রতারিত না হয়ে, আমরা তৃতীয় ধারা অর্থাৎ বাম-গণতান্ত্রিক ধারা ও শিবিরকে শক্তিশালী করতে থাকবো এই নির্বাচনেও।

লেখক পূর্ণেন্দু বসুর জবাব :

অনীক পত্রিকার সম্পাদক মশাইয়ের অনুরোধ 'পরিবর্তনের মানে' শীর্ষক একটা লেখা লিখেছিলাম। সেই লেখায় আমার প্রাসঙ্গিক অবস্থান ব্যক্ত হয়েছিল। আমি মনে করি, সোজা কথা সোজাভাবেই বলা ভাল। আমার লেখা সম্পর্কে শ্রীশঙ্কর মিত্র একটি সমালোচনামূলক লেখা লিখেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ, আমার লেখাটি পড়ার জন্য এবং মতামত দেওয়ার জন্য। শ্রীমিত্র তেমন কোনও নতুন কথা লেখেন নি। তাঁর সমালোচনার জবাব আমার পূর্বোক্ত লেখার মধ্যেই আছে। 'বিপ্লবী বামপন্থী'-রা ভালো কাজ করলে আমি আনন্দ পাই। কিন্তু তৃণমূল দল বা মমতা ব্যানার্জী সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য এবং সিপিএম নেতাদের বক্তব্য যখন এক হয়ে যায়, তখন কষ্ট পাই।

'পরিবর্তন' সম্পর্কে বা তৃণমূল দল সম্পর্কে শ্রীমিত্রের মূল বক্তব্য সিপিএম নেতাদের বক্তব্যের অনুরূপ। এ বিষয়ে আমার মূল্যায়ন ভিন্ন। আমার ভাবনা আমি স্পষ্ট করেই রেখেছি। নতুন করে আর বলার কিছু নেই।

আমি বিকল্পের 'দাবিদার' নই। বাস্তবের চিত্রটা শুধু তুলে ধরেছি। শুধু ভুরু কোঁচকালেই বুদ্ধি বাড়ে না। বাস্তব অনুশীলন ছাড়া ভুরু কোঁচকানোতে কোন লাভও হয় না। সেই অনুশীলন কোথায়? আমার বিকল্প সম্পর্কে 'দৃষ্টিভঙ্গি' যদি কারও গলা দিয়ে না নামে, তাতে আমার কিছু করার নেই। চেষ্টা করবো, আরও নরমভাবে লিখতে। 'স্বতঃস্ফূর্ততার উদ্বাহু পূজা' না করাটাই শ্রেয়। তবে সচেতন অনুশীলন এবং এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাটা থাকা দরকার। সেটাই কাম্য। আমি 'বিপ্লবী বামপন্থী'দের আত্মসমীক্ষার কথা বলেছি। আমার অবস্থানের সাথে অনেকেই একমত না হতে পারেন। কিন্তু নিজেদের উপলব্ধির প্রয়োগ ও তার ফসল তুলতে হবে তো! চোখে আঙুল দিয়ে বাস্তবের মাটিতে আমার 'ভুল' প্রমাণ করতে হবে।

'দক্ষিণপন্থা', 'বামপন্থা'-র বিতর্ক অনেক হয়েছে। শ্রেণী বিশ্লেষণও কম হয়নি। আগমার্কা তাত্ত্বিক অবস্থানের কথা, নিজেদের সঠিক বলে 'দাবি' করার কথাও অনেক বলা হয়েছে। এতে নিজেদের প্রান্তিক হয়ে পড়াকে ঠেকানো যায় নি।

শেষ করার আগে বলবো, শ্রী মিত্রের সাথে আমার মতামতের ফারাকটা মৌলিক। আমি কারও 'তাঁবেদারি' করছি না। যেটুকু করছি, তা বিবেকের দায়ে। নিজের বিবেককে কোনও বিশুদ্ধবাদী তত্ত্বের পরিসীমায় বন্দী করতে পারিনি আজও। মানুষের সাথে থাকার চেষ্টা করছি মাত্র। মানুষই পথ দেখায়— এই বিশ্বাস নিয়েই পথ চলছি।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ïj£-jî‰ Zîû˜ËÍ ï¸ ¯˜

প্রসঙ্গ লাদেন হত্যা q পস্কো-বিরোধী আন্দোলন

মিশরে বিপ্লব চলছে q জন্মশতবর্ষে ফয়েজ

রবীন্দ্র-নাট্য প্রসঙ্গ : রক্তকরবী/মুক্তধারা

ফকসিমা এখন q তপন দত্ত হত্যা

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

[illegible] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible] [redacted]

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[redacted]

[illegible] [redacted]

[illegible]

[redacted] [illegible]

[redacted]

[illegible] [redacted] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[redacted] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[illegible]

[redacted]

[illegible] [redacted]

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

POSTAL REGN. NO. : WB / BRS / RNP-105 / 2007-09 R.N.I REGN. NO. : 12026/65

ANEEK q 47TH YEAR : 11TH ISSUE q MAY 2011 q RUPEES FIFTEEN ONLY

অনীক

মে ২০১১

সম্ভাব্য সূচি

নির্বাচনী সমীক্ষা : ২০১১

q **উন্নয়ন : নতুন দিশা** (অমিত ভাদুড়ী ও অন্যান্য)

q **প্রসঙ্গ উৎপল দত্ত** (বিভাস চক্রবর্তী)

q **গোধরা মামলার রায়** q **বাদল সরকার স্মরণে**

প্রকাশিত হবে মে-এর মাঝামাঝি সপ্তাহে

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

অনীক : যোগাযোগের ঠিকানা পাল্টে গেছে

অনীক । প্রযত্নে : পিপলস্ বুক সোসাইটি । ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা - ৭০০ ০০৯ (ফোন : ০৩৩-২২১৯-৯২৫৬)

---

v¿ò¥§¿ù¿àîÂÂóÅËþ±Ëò±ùÑàÉ+&¿ùÂó±Ýþ±ûËÈBåv

q পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা/সাঁওতাল বিদ্রোহ ১৫০/ভারতে আর্থিক উদারীকরণ/সিপিআই(এম)-এর মাও চর্চা— প্রতিটি ১০

q সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদ/ ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ফোরাম/ জল সমস্যা/আজকের চীন — প্রতিটি ১৫

q পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস (১+২)/আজকের নেপাল (১+২)— প্রতিটি ২০

q গৈরিক ফ্যাসিবাদ/ সিপিআইএম কোন পথে?/বিশ্বায়ন/ইরাক যুদ্ধ/ভারত, ভালো আছো? (*ক্রোড়পত্র : পল সুইজি*)/ নেপালের বিপ্লবী আন্দোলন/নন্দীগ্রাম গণহত্যা/নাগরিক সমাজ ও পশ্চিমবঙ্গ— প্রতিটি ২৫

q জন্মশতবর্ষ (জীবনানন্দ, নজরুল, তারাশংকর, আইজেনস্টাইন, ব্রেশট, আব্বাসউদ্দিন)/পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কোন্ পথে?/— প্রতিটি ৩০

q বিশ্বায়ন ও প্রতিরোধের বিশ্বময়তা/জাতপাত, মৌলবাদ ও ভারত/জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদ — প্রতিটি ৩৬

q উন্নয়নের বামপন্থী ধারা ও পশ্চিমবঙ্গ — ৪৫

q বর্তমান বিশ্বে বামপন্থী আন্দোলন/উন্নয়নের বামপন্থা/পরিবেশ অর্থনীতি রাজনীতি বিজ্ঞান— প্রতিটি ৪৫

â *ডাকযোগে নিতে হলে পত্রিকার মোট দাম ও রেজিস্ট্রেশনের খরচ বাবদ ২০ টাকা অতিরিক্ত পাঠাতে হবে।*

â *হাতে নিতে হলে পিপলস বুক সোসাইটিতে মোট দাম জমা দিয়ে এক সপ্তাহ পরে সেখান থেকেই পত্রিকা নিতে হবে।*

দীপংকর চক্রবর্তী (স্বত্বাধিকারী) কর্তৃক প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com